ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের সাধনা।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

ভক্তগণ যে ধর্ম্মের পুরস্কাররূপে ভগবানের নিকট হইতে সাংসারিক ধনমান সুখসৌভাগ্য লাভ করেন, একথা সত্য নয়; বরং অনেক স্থলে ইহার বিপরীত কথাই সত্য। কিন্তু তাঁহারা যে সাংসারিক দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনা, এমন কি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিবার অতি আশ্চর্য্য শক্তি লাভ করেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কত লোক যে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া মহোল্লাসে ঈশ্বরের জয়গান করিয়াছেন; কত লোক যে ঘাতকের কৃপাণকে, সিংহব্যাঘ্রের কবলকে এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডকে তুচ্ছ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করিবে কে? একটীমাত্র মিথ্যা কথা বলিলে যখন ভীষণ যন্ত্রণাময় মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইতেন, জীবন-মরণের সেই মহাসন্ধিক্ষণে যে তাঁহারা সত্য হইতে বিচলিত হইলেন না, সে দুর্জ্জয় শক্তি তাঁহাদিগকে কে দিল? যে শোকের বেদনা কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব, এরূপ তীব্র শোকে ধর্ম্ম যে কত লোকের অন্তরে সান্ত্বনা দান করিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? কত মুমূর্ষুর প্রাণে যে অন্তিম মুহূর্ত্তে ধর্ম্ম আশা শান্তি ও বল সঞ্চার করিয়াছে, তাহা গণনা করিবে কাহার সাধ্য? মানুষ মানুষকে যতই ভালবাসুক, কিন্তু মানুষ ঈশ্বরপ্রেমে যেরূপ মুগ্ধ হয়, মানুষকে ভালবাসিয়া কখনও সেরূপ মুগ্ধ হয় না। কত লোক যে ঈশ্বরের সহিত অবিচ্ছিন্ন যোগানন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য গৃহপরিবার আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জন অরণ্য ও নিস্তব্ধ গিরিগুহায় আশ্রয় লইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করিবে কে? তবে কি বলিব না যে ঈশ্বরের প্রেমে মুগ্ধ হইবার জন্যই মনুষ্যহৃদয় গঠিত হইয়াছে? ভগবান ব্যতীত মানব-প্রাণের উচ্ছ্বসিত প্রীতিভক্তি আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি আর কোথাও সম্ভব নহে।

বর্ত্তমান কালে আমরা বাহির লইয়া থাকি। বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা আমরা দিন দিন জড় প্রকৃতির উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করিতেছি। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞান যে সকল সুখস্বচ্ছন্দতা সৃষ্টি করিয়াছে, সে-কালে সে সকল কিছুই ছিল না; এই কথা স্মরণ করিয়া আমরা অহঙ্কারে স্ফীত হই এবং সে-কালকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখি। কিন্তু আপনার মনকে সংযত করা, আপনার ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা, ইলেক্‌ট্রীক লাইট, এরোপ্লেন ও রেডিও অপেক্ষা কি বড় কথা নয়? হৃদয়কে নীচ কামনা ও স্বার্থপরতা হইতে নির্ম্মল রাখা এবং নিষ্কাম প্রেমভক্তির সহিত ভগবানকে হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা জড়জগতের উপরে প্রভুত্ব-স্থাপন অপেক্ষা কি অনন্ত গুণে বড় কথা নয়? এই মহা সৌভাগ্য আমরা সকলেই লাভ করিতে পারি। যদি আমরা ইহাতে বঞ্চিত হই, তবে জীবনের সর্ব্বোচ্চ সৌভাগ্যে বঞ্চিত হই।

ভক্ত বিশ্বাসীগণের উপদেশ এই যে ধর্ম্মলাভ করা কাহারও পক্ষেই অসম্ভব নহে, কিন্তু ইহার জন্য সুদৃঢ় অধ্যবসায় বা সাধনার প্রয়োজন। মানুষের এই সাধনার উপরে আশীর্ব্বাদরূপে ভগবান চিরদিন তাঁহার কৃপাবারি বর্ষণ করিয়া থাকেন। কখনও বা ইঙ্গিত ও অনুজ্ঞারূপে, কখনও বা উৎসাহ ও অনুপ্রাণনারূপে, কখনও বা অপরাধের জন্য ভৎর্সনা ও ধিক্কাররূপে, কখনও বা পুণ্য ও পবিত্রতার জন্য অগ্নিময়ী আকাঙ্ক্ষারূপে তিনি আমাদিগকে তাঁহার চরণে আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক সে আহ্বান আমরা অবহেলা করি। আমরা প্রায় সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, কিন্তু এই বিশ্বাস নামে মাত্র বিশ্বাস। আমরা তাঁহার যে পূজা ও উপাসনা করি, তাহা অনেক স্থলেই নিয়মরক্ষা মাত্র বা বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র। আমরা কচিৎ কখন তাঁহার প্রতি একটু কৃতজ্ঞতা অনুভব করি, কিন্তু সে অনুভূতি কত ক্ষীণ! আমরা তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বসাক্ষী বলিয়া মতে মানি বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ মনে করি তিনি বহুদূরে। তাঁহাকে জীবন্ত জাগ্রত দেবতা বলিয়া দেখি না। তাহা যদি দেখিতাম, জীবন পবিত্র সরস ও মধুময় হইত, পরোপকারের স্পৃহা অনন্ত গুণে বর্দ্ধিত হইত, হৃদয় আনন্দে শান্তিতে প্লাবিত হইয়া যাইত।

প্রশ্ন এই যে, ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবার উপায় কি? উত্তরে ভক্ত বিশ্বাসীগণ বলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানকে সমুজ্জ্বল করা আবশ্যক এবং সেজন্য গভীর এবং অবিশ্রান্ত চিন্তার প্রয়োজন। যেমন পরের চক্ষুর দ্বারা দেখা হয় না, সেইরূপ পরের ধ্যানলব্ধ সত্য শুনিয়া ধর্ম্ম হয় না। দ্বিতীয় কথা এই যে, শাস্ত্র পাঠ করিতে হইবে; কিন্তু এ বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক। কারণ সকল শাস্ত্রের মূল্য সমান নহে। মহাপুরুষগণ ভগবৎস্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, ধর্ম্মলাভের জন্য যে উপদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহাদের জীবনের মহাভাব—এই তিনটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। তৃতীয় কথা এই যে বহির্জগতে ভগবানকে দর্শন করিতে হইবে, অন্তর্জগতে অর্থাৎ মানবপ্রকৃতিতে তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে, এবং আমাদের নিজ নিজ জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার বিশেষ কৃপা দর্শন করিতে হইবে। ভক্তগণ বলেন যে, প্রত্যেক সাধনার্থীর

প্রয়োজন অনুসারে তাহার মঙ্গলের জন্য ভগবান নানা ঘটনা নানা অবস্থার ভিতর দিয়া বিশেষ বিধান করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে কোন অলৌকিক ব্যাপার থাকে না, অথচ এই সকল অবস্থা ও ঘটনার সহিত সাধনার্থীর ধর্ম্মজীবনের সম্বন্ধ অতীব নিগূঢ়।

ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে যে সকল উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন, সেই সকল উপায়ের মধ্যে বুদ্ধির আলোকে ভগবান সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান উপার্জ্জন করা খুব বড় কথা নয়। এইটী বাস্তবিক সর্ব্বাপেক্ষা ছোট কথা। যাহা তাঁহার ইচ্ছা বলিয়া বুঝিব, তাহা যদি পালন না করি, তবে তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া কোন ফল নাই। শাস্ত্রপাঠের দ্বারা এবং পণ্ডিত লোকদিগের সহিত বাস করিয়া আমরা বিশুদ্ধ মত শিক্ষা করিতে পারি; কিন্তু বিশুদ্ধ মত ও ধর্ম্মজীবন এক বস্তু নহে। এ দুটীতে বিস্তর প্রভেদ। মত কেবল কথামাত্র। মতকে জ্ঞান বলাই উচিত নহে। যে ব্যক্তি ইচ্ছাপুর্ব্বক চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার পক্ষে সূর্য্যদর্শন যেমন অসম্ভব; যে ব্যক্তি লোভী স্বার্থপর ইন্দ্রিয়াসক্ত ও অলস, বিবেক যাহার দগ্ধ এবং হৃদয় যাহার কঠিন, তাহার পক্ষেও ঈশ্বরদর্শন সেইরূপ অসম্ভব। যে ব্যক্তি দৃঢ়ব্রত এবং সংযতচিত্ত নহে, মানবের প্রতি যাহার প্রেম নাই ও বিবেকের অনুজ্ঞাকে যে তুচ্ছ করে—বিদ্যাবুদ্ধির সাহায্যে তাহার একপদও ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইবার সাধ্য হইবে না। ভগবান যে পুণ্যময়, একথা আমরা শাস্ত্রে পাঠ করিতে পারি এবং লোকের মুখে শুনিতে পারি; কিন্তু যতদিন সকল প্রকার পাপ ও মলিনতা পরিহার করিতে আমরা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক প্রাণপণে চেষ্টা না করি, ততদিন ভগবান পুণ্যময় এ সত্যটী আমাদের কাছে নিতান্তই কথার কথা থাকে। সেইরূপ যতদিন আমরা লোভ ও স্বার্থপরতাকে অতিক্রম করিয়া পরোপকারকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ না করি এবং জনসমাজের মঙ্গলসাধনে চেষ্টা না করি, ততদিন ভগবান যে মঙ্গলময়, এ সত্যটীর আভাস পর্য্যন্তও আমরা ধরিতে পারি না। যখন আমাদের আত্মা সত্যে এবং সাধুতাতে সমুন্নত হয়, তখন আমরা আত্মার শক্তি ও সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারি; তখন বুঝিতে পারি যে মানবাত্মা সৃষ্টির ভূষণ; তখন অনুভব করি যে সত্য সত্যই ইহা মৃত্যুহীন; নতুবা অনন্ত জীবন আমাদের কাছে শুধু একটা মত মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। বুদ্ধির সহিত বিবেককে না মিলাইলে এবং জ্ঞানের সহিত নীতিকে না মিলাইলে কেবল পরের উপদেশে ব্রহ্মদর্শন হয় না।

তত্ত্ববিশ্বাসাগণের উপদেশ এই যে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রযত্নে হৃদয়কে নির্ম্মল করিতে হইবে। রিপুকুলের দাসত্ব হইতে এবং কু-অভ্যাসের শৃঙ্খল হইতে মুক্তির জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতে হইবে। যাহাতে তাঁহার ইচ্ছার অনুগামী হইতে পারি এবং তাঁহাকে হৃদয়ে লাভ করিতে পারি, তাহার জন্য তাঁহার নিকটে বল ভিক্ষা করিতে হইবে। সে প্রার্থনা কখনও বিফল হইবে না। আকাশ হইতে একটা গূঢ় শক্তি আমাদের অন্তরে অবতীর্ণ হইবে। দেবনিঃশ্বাস লাভ করিয়া আত্মা উৎসাহে অগ্নিময় হইবে। দিন দিন ভগবানের সঙ্গে যোগ গভীর হইতে গভীরতর হইবে। পৃথিবীর জীবন ফুরাইলে পরলোকের অনন্ত পথে চলিতে চলিতে ভগবানকে আমরা কিরূপ উজ্জ্বলভাবে দর্শন করিব, তাহা আমাদের কল্পনার অতীত। সে দর্শনের তুলনায় ইহজীবনের দর্শন অতি অস্পষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ইহজীবনেই তাঁহার দর্শন এত সরস ও মধুময় হইতে পারে যে, ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে সে সরসতা সে মধুরতা আমরা ভাবিতেও পারি না।

ভগবান স্বহস্তে মানবঅন্তরে ধর্ম্মের বীজ নিহিত করিয়াছেন। আমাদের বুদ্ধির সাহায্যে আমরা তাঁহার তত্ত্ব কথঞ্চিৎ অবধারণ করিতে পারি, আমাদের হৃদয় দিয়া তাঁহাকে প্রীতি ও ভক্তি করিতে পারি, আমরা ইচ্ছা করিয়া তাঁহার বিধানকে মস্তকে বরণ করিতে পারি। আমাদের আত্মারূপ চক্ষুর দ্বারা আমরা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি। এ কি মহা গৌরবের অধিকার! এই অধিকার তুচ্ছ করিয়া আমরা সংসারের মোহে ডুবিয়া থাকি! এই আমরাই তাঁহার মন্দির হইতে পারি। এমন কি তাঁহার মহিমা ও তাঁহার আনন্দস্বরূপের কিঞ্চিৎ আস্বাদনও আমরা লাভ করিতে সমর্থ। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা ধ্যান ও চিন্তা দ্বারা এবং সুদৃঢ় আনুগত্য দ্বারা তাঁহার আলোক ও পবিত্রতা লাভ করিতে পারি। ইহাই আমাদের পুণ্যময় স্বর্গীয় জীবনের আরম্ভ। সেই পরাৎপর পুরুষের সহিত যোগের যে মত্ততা ও বিহ্বলতা, মানুষের ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম।

THE

BRAHMA SAMAJ

UNDER

DEVENDRANATH THAKUR.

CHAPTER II.

(6)

69. D. N. Tagore's Missionary work.

Devendranath Thakur, ever since his embracing the Brahmic faith, has visited various parts of India, leaving out of account the innumerable places he vesited in Bengal, preaching and proclaiming the Brahma religion among the people and establishing Samajes. He travelled to Lahore, Multan, and Amritsar, and officiated on more than one occasion as chief minister at the anniversary festivals of the Samaj at those places. He visited many parts of India for this holy purpose and preached his religion to the various races of Hindus, who acknowledge obedience to the Sanskrit and the Vernacular Scriptures, such as the Granths of Guru Nanak of the Panjab. Among other places he visited Bareilly in 1860. He received a regular ovation from the people of that place, both Hindu and Mussalman notables flocking to do him honor and hear his discourse.

70. Lala Hazarilal the first missionary 1765 *Saka*.

As the Mofussil Samajes began to increase, it was found that they required ministers and missionaries. The most competent students, who had been trained up in the Vedic school of the *Tattwabodhini Sabha* in Calcutta, were chosen for the post of minister. The first Brahma missionary on record was Lala Hazarilal, an upcountry Kayastha, and a native of Indore. He was appointed a missionary soon after the institution of the Brahma covenant in 1765 Saka. He was known to be an able and indefatigable preacher, going from house to house with the Brahma covenant in his hand, discussing with all parties on the absurdities of their popular faith, creed, customs and usages, and communicating to them the sacred truths of their original Sastras, the Vedas and Vedantas.

71. Divine Love introduced in discourse by Rajnarain Bose.

It was at this time that the doctrine of *Divine Love* was first preached as an essential element of the *Brahma* religion in sermons delivered by Rajnarain Bose before the *Adi Brahma Samaj*. The discourses of the *Samaj* used hitherto chiefly to dwell upon the power, wisdom, and goodness of the Deity, as exhibited in his works. They did not treat of His love, which wins our hearts to a warm adoration of the Altogether Beautiful. The doctrine of *Divine Love* is inculcated in the Vedanta in the clearest language, "*Raso vai sah*," "He is all Love ;" "*Atmana meva priya mupasita*," "God should be worshipped with love." The song of songs of the wisest of men is replete with sentiments of love to the "*Best Beloved*." The highest phase which religion can attain is deep and fervent love of God, but it should not certainly culminate in actual frenzy or madness like that of the Howling Derveshes of Constantinople.

72. The Brahmo Dharma and its contents.

Now that the Samaj had taken a firm hold of the minds of the people, and had gradually extended itself over a good portion of the country, the want of a text-book was much felt by the people of the Mofussil, who had no means of ascertaining all the articles and principles of the Brahma creed, and the modes of its worship. This was undertaken at the suggestion of Rajnarain Bose, made by him immediately after his conversion to Brahmaism in 1846, in a letter addressed to Devendranath Thakur on the subject, and the book, the *Brahma Dharma*, after two years of labour and research, was finished by Devendranath Thakur. It contains the Vedic and other scriptural texts with their Bengali translation, on the existence and attributes of the One True and Living God of the World, and the best and the most rational mode of His adoration. Long analyses of this compilation are given in the extant histories of the church, but I will simply give the substance, for the information of those who are unacquainted with the original. It embodies the Brahmic covenant spoken

of above, with the *Dharma Vija* setting forth the principles of Brahmic faith, and the Brahmic form of divine worship as observed in the Samaj. The first part of the Grantha contains texts from the Upanishads about the existence and attributes of God, and the duty of contemplating and worshiping Him. The second part consists of moral precepts from Menu, Yajnyavalkya, Mahabharata, Maha Nirvana Tantra, and other Hindu Sastras. Both parts are accompanied by a Bengali translation, with an ample commentary and exposition in that language. Devendranath Thakur wrote the exposition of the first part, jointly with Akkhaya Kumar Datt and Rajnarain Bose. The exposition of the second part was written long after by Pandit Ayodhyanatha Pakrasi, a minister of the *Samaj*.*

73. Renunciation of Vedantism and the Infallibility of the Vedas and the Establishment of Pure Theism.

From the publcation of the *Brahma Dharma Grantha* may be reckoned the date of the public renunciation of Vedantism. The principal cause which led to this important step was, the detection of errors and contradictions in the Vedas, which had been hitherto regarded as the revealed word of God. There were conflicts of opinion between Devendranath Thakur and Akshaya Kumar Datt, on the question of Vedic infallibilty, the latter being against the doctrine of such infallibility. Finally truth triumphed. The *Brahma Samaj* abjured the said doctrine and ceased to be a Vedantic Church, although the Brahmas still believe that the truths contained in the Vedas most of which have been brought together in the *Brahma Dharma Grantha* were the results of the inspiration (the word is here used in no miraculous sense) of the Rishis who composed the Vedas. The Vedantic element of Sankara was eliminated from the Brahmic covenant, and the fundamental principles of Theism substituted for it.

74. Brahmo Dharma Bijam.

Four articles of faith entitled Brahma Dharma Vija were drawn up by Devendranath to which future candidates for admission into the *Brahma Samaj* were required to subscribe. Thus Vedantic unitarianism was superseded by Natural Theism and the *Brahma Samaj* became a Theistic Church and the *Brahma Dharma Grantha*, inculcating pure theism only, was proclaimed by the *Brahma Samaj* to contain a complete exposition of the principles of their religious belief. The Vija of the Brahmas, which answers to the Creed of the Christians and the Kulma of the Mahomedans, is composed of the following four articles of belief :—

1. One only God before this was, and nothing else was co-existent with him. He has created whatever there exists.

2. He is eternal, intelligence itself, infinite, all-good, all-apart, without parts, one without a second, all-pervading, governing and supporting everything, omniscient, omnipotent, perfect, immutable, without a likeness.

3. His worship alone ensures all present and future bliss.

4. Love of Him and doing the works he loves, is his worship.

This last article is at once a definition of the best mode of adoration, and an excellent precept for our guidance in leading a religious life. It is, says Rajnarain Bose, superior to the precept of the Bible : "Love thy neighbour as thyself," where self is taken for the standard of our

---

What the *Indian Mirror* says ?

* The *Indian Mirror*, in its issue of the 21st April 1878, speaking of the *Brahmo Dharma Grantha* shays : "It represents the deepest thoughts of a very deep and singular man, the like of whom is not easily met with in this or in any other counory." "It contains his mature reflections on the chosen passages of the Upanishads, the early source of his wonderfull conversion, and still the fresh and full fountain from which his grand spirit drinks truth, inspiration, joy and sanctity, reflects all the light, all the wisdom, which his trained and experienced mind can throw upon them, sets forth short and effective sermons on all manner of devotional speculation and practical subjects, which those texts suggest. It opens out a large area of critical and scriptural thought very attractive to the devout and meditative students."

action towards others, and not the disinterested standard of the will of God.

75. First public declaration of Theism —1772 *Saka* (1850 A.D.)

The first public declaration of pure theistic faith was made by Akkhaya Kumar Datt, in an anniversary discourse delivered by him at the Samaj in 1772 Saka (1850 A. D.), wherein he asserts, that the revelation of Nature is the only revelation which the Brahmo can believe, and that, that was the only standard of the faith of Ram Mohun Roy, whom he highly eulogised in that discourse.

76. Characteristics of Brahmoism as enunciated by Rajnarain Bose— 1775 *Saka* (1853 A. D.)

Shortly after the Samaj had publicly renounced the doctrine of Vedic infallibility, Rajnarain Bose, in a sermon delivered in Saka 1775 (1853 A.D.), described the principal characteristics of Brahmaism to be—

1. It admits people of all nations and castes within its folds.

2. There are no fixed and superstitious rules about time and place for Divine worship in this religion.

3. There are no written Scriptures in this religion.

4. There are no hard penances and austerities in this religion. Abstinence from vice is the only austerity.

5. This religion does not say that a man should forsake his family and retire to a forest for the purpose of worshiping God.

6. There are no external rites and ceremonies in this religion.

7. There are no places of pilgrimage in it. The pure heart is the best place of pilgrimage.

8. The only expiation for sin in this religion is heartfelt and sincere repentance and abstinence in future from vice.

77. The T. Patrika's motto changed.

More attention now began to be given to the instruction of youths in the *Brahhma Dharma Grantha* as used formerly to be bestowed on instruction in the Vedas. The motto of the *Tattwabodhini Patrika* was also changed for the celebrated sentence in the Mundaka Upanishad, "The inferior knowledge is the Vedas and the Vedangas, and the superior knowledge is that by which the Undecaying God is known." This is explained as meaning that Divine knowledge is independent of the Scriptures and is to be obtained only from the intuitions of the human soul and the contemplation of external nature.

78. *Nova organa.*

These three improvements, that is, regular Divine worship, Brahmic Covenant, and *Brahma Dharma Grantha*, emanating from Devendranath were reckoned as the *nova organa* of Brahmaism, and supplied the desiderata left unsupplied by the untimely death of Ram Mohun Roy.

79. Theory of intuition in the Brahmo Somaj.

Shortly after this the theory of intuition was broached in an article headed "Dharma Tatwa Viveka," published in the *Patrika*. It emanated from the pen of Akkhaya Kumar Datt, who derived his first idea on the subject from the Mundak Upanishad which says : "Ekayatmapratyasaram"—the best proof of God's existence is "intuition," and derived much aid in developing it from European works on the philosophy of religion.

This theory has been still more developed by Rajnarain Bose in his treatise named the "Dharma Tatwa Dipika," or the Lamp of Religious Knowledge, being a large work on theism, both doctrinal and practical. It treats of the philosophy of religion in the first few chapters. This book has already become a standard work among the Brahmas. Henceforth Brahmaism was regarded not only as Natural Religion based on conclusions drawn by reasoning from the facts and phenomena of Nature, which, although not perfectly satisfactory, are good so far as they go, but a faith founded on the sure basis of intuitive truths deeply engraven on the minds of man, and which he cannot ignore without ignoring his own existence.

Though intuition and its evidence are denied by many modern metaphysicians, Locke, who acknowledges no innate principle whatever, maintained however the intuitive knowledge of Divine existence in his arguments on the subject. According to some philosophers, the knowledge of God is supposed to be one of those primary notions and common beliefs which form the element of original knowledge prior to all reasoning.

80. Devendranath retired to Himalayas —1778 *Saka* (1856 A.D.)

In 1778 Saka (1856 A. D.), Devendranath Thakur retired to the Himalayas for the sake of solitary contemplation, of which, as remarked before, he was excessively fond. There he read the works of Fichte, Kant, and Cousin, with great attention, and, as a friend informed us, also studied the mystic lyrics of Hafiz in order to acquaint himself with the nature of Sufi poetry and religion. He returned to Calcutta after the Sepoy rebellion was quelled.

81. His celebrated "Byakhyans."

As fruits of his meditation during his Himalayan retirement, we have his celebrated Vyakhyanas or Sermons, which are universally praised by all Brahmas.

82. Devendranath Thakur and Ramaprasad Ray appointed trustees at a meeting.

During his absence in the Himalayas, a business meeting of the Samaj was held presided over by Ramanath Thakur, afterwards Maharaja, at which it was resolved that Rama Prasad Roy and Devendranath Thakur be appointed trustees of the *Samaj* from that day, in the place of Radha Prasad Roy and Vaikantha Nath Roy Chaudhuri, deceased.

83. Widow Marriage and T. Patrika.

At this time the *Tattwabodhihi Patrika* was taking an active part in advocating widow marriage, a question which was agitated in a pamphlet by Pandit Iswara Chandra vidyasagar. An Act of Government was passed legalizing the marriage, and Rajnarain Bose, a member of the *Samaj*, was one of the first to introduce it into his own family.

84. Incorporation of T. Sava with the Brahmo Samaj—1781 *Saka* (1859 A. D.)

After the return of Devendranath Thakur from the the Himalayas, a meeting of Brahmas was held in 1781 Saka (1859 A.D.) at which it was resolved that two distinct societies, the *Tattwabodhini Sabha* and the *Brahma Samaj*, were unnecessary for the propagation of the Brahma religion, and that the *Tattwabodhini Sabha* be merged into the *Brahma Samaj*. This led to the final dissolution of the *Tattwabodhini Sabha* mentioned before and its incorporation with the *Brahma Samaj*.

রাজা রামমোহন রায়ের সহজসাধন

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ)

পাখী জন্মের সঙ্গে সঙ্গে লাভ করে বাধাবন্ধহীন সহজ স্বচ্ছন্দ গতি ; সে কখনো প্রভাতসূর্য্যকিরণে অনুরঞ্জিত নীল আকাশের নিম্নে বিচিত্র পাখা মেলিয়া ছুটে যায় দূর-দূরান্তরে বন-বনান্তরে ; বনের ফলে নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ সলিলে ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করে দিন দিন পক্ষী-জীবনের আনন্দ-রসধারা পান করে কৃতকৃতার্থ হয়। কিন্তু যদি সে অসীমের যাত্রী পাখীকে সীমার পিঞ্জরে আবদ্ধ করে তার স্বাধীন গতিকে রুদ্ধ করা যায়, তবে সে হারিয়ে ফেলে জীবনের আনন্দ, থেমে যায় তার কণ্ঠের স্বাভাবিক কল-কাকলী। দিনে দিনে সে হয় অন্ধ নিয়মানুবর্ত্তিতার দাস। তখন সে শিখে মানুষের শেখান বুলি ; ক্রমে ক্রমে ভুলে যায় নিজের জন্মগত অধিকারের দাবী। বাহিরে অনন্ত নীল আকাশ তাকে ডাকে—আয় ; বন-বনানী তরুগুল্ম বনস্পতি শাখা-বাহু নেড়ে ডাকে—আয় ; মেঘের ফাঁকে সূর্য্যকিরণ ডাকে—আয় ; উষার লোহিত আভা পূর্ব্বদিক্ উদ্ভাসিত করে ডাকে—আয় ; ফুল ডাকে আয় ; অপরাপর স্বচ্ছন্দবিহারী পাখী কল-ঝঙ্কারে ডাকে—আয়। কিন্তু সে তখন তাদের ডাকে সাড়া দেয় না, তাদের ডাকে তার প্রাণে কোন বেদনার স্পন্দন জাগিয়ে তোলে না। যদি কখনো সে নিজের পূর্ব্বস্বরূপের স্মৃতি ফিরে পায়, তবে তখনই সে মুক্তির

উপায় খোঁজে, তখনই সে জন্মগত অধিকার স্বচ্ছন্দ সহজ গতির দাবী স্বীকার করে' মনে বেদনা অনুভব করে, হয় ত সে সুযোগ পেয়ে পিঞ্জর ছেড়ে মুক্ত নীলাকাশে অসীমের রাজ্যে উড়ে যায়; আর যদি তা না পারে, তবে দিন দিন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে পলে পলে মৃত্যুর কবলে নিপতিত হয়।

মানবের জীবনও পাখীর জীবনের অনুরূপ। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মানবের জন্মগত ধর্ম্মপ্রবণতা জেগে ওঠে। কিন্তু যতই সংসারের আবিলতা কুটিলতা, হিংসা দ্বেষ ও পিশুনতা মানবকে আপনার বুকে টেনে নেয়, ততই ধর্ম্মবুদ্ধি মলিন হ'তে আরম্ভ করে; অবশেষে মানব নিজের জন্মগত অধিকার বিস্মৃতির অনন্ত অতলে নিক্ষেপ করে, সাংসারিক ভোগসুখে মত্ত হয়।

অমৃতের পুত্র মানব অমৃতময় ব্রহ্মলোক হতে ধরণীর মালিন্য-কালিমার অভ্যন্তরে যতই প্রবেশ করতে থাকে, ততই শাশ্বত সহজ ধর্ম্মপ্রবণতা ম্লান হয়ে আসে; স্বপ্নাত্মক জড়িমা জাগরণের মধ্যে দেখা দেয়, পৃথিবীর ক্ষুদ্র সুখদুঃখ মানবের হৃদয় অধিকার করে। তখন সে তার বিরাট দাবীর কথা ভুলে গিয়ে নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করে। পেচক যেমন সূর্য্যকিরণ সহ্য করতে না পেরে দূরে বৃক্ষকোটরে লুক্কায়িত হয়ে দিনমান যাপন করতঃ নৈশ তিমিরের প্রাদুর্ভাবে জীবজগতে খাদ্যান্বেষণে বহির্গত হয়, বিস্মৃতিপ্রভাবে লুপ্তদৃষ্টি মানবও অমৃতময় ব্রহ্মের নিকট থেকে দূরে সরে গিয়ে জাগতিক ভোগসুখে আমোদ অনুভব করে। ধাত্রীর স্তন্যপানরত শিশু ধাত্রীর স্নেহে বশীভূত হয়ে পিতামাতাকে অনেক সময় ভুলে যায়; শিশু জানে না ধাত্রী পিতামাতার বেতনভুক্ পরিচারিকা মাত্র,—তার আসল স্নেহের দাবী পিতামাতার শান্তি-সুখময় ক্রোড়ে। আবার অনেক সময় দেখা যায়, ধাত্রীও শিশুকে পিতামাতার কথা ভুলিয়ে দিয়ে আপন করে নেবার চেষ্টা করে। মানবের অবস্থাও ঠিক তাই—ধরিত্রী-ধাত্রীর বুকে মানবশিশু সামাজিক ও জাগতিক বাসন-বিলাসের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে নিজের শাশ্বত অধিকারের দাবী পরিহার করে।

অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্মকে প্রচ্ছন্ন করে, খণ্ডের গণ্ডী আমাদের চারিদিকে গড়ে ওঠে। গুটিপোকা যেমন স্বীয় মুখনিঃসৃত লালার সমবায়ে নিজে চতুর্দ্দিকে গণ্ডী রচনা ক'রে তার মাঝে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, কিন্তু জানেনা ঐ গণ্ডীই তার স্বরচিত শ্মশানশয্যা; মানুষও তেমনি ক্ষুদ্রতার সসীম আবেষ্টনীর মধ্যে যখন নিজেকে বদ্ধ করে রাখে, যখন শাশ্বত ব্রহ্মের বাণী বৈদ্যুতিক প্রবাহ নশ্যুক্ত বেতার-যন্ত্রে প্রতিহত সঙ্গীতের মত হৃদয়দ্বারে প্রত্যাহত হয়ে ফিরে যায়, তখন সত্য সত্যই আমরা মরণের দিকে অগ্রসর হই। সৌভাগ্যবশতঃ গুটিপোকার দু'একটি যেমন নিজের আবদ্ধাবস্থা বুঝতে পেরে রেশম-বেষ্টনী ছিন্ন ক'রে বিচিত্র পাখা মেলে অনন্ত নীল গগনে উড়ে যায়, মানুষের মধ্যেও তেমনি দু'একটা পাগল বিস্মৃতির আবরণ উন্মোচন করে নিজের জন্মগত অধিকারলাভের জন্য ছুটে যায়। সামাজিক মানব যখন দেখে, তার গণ্ডীর-সীমা উল্লঙ্ঘন করে একটা লোক ভিন্ন পথে ছুটে যাচ্ছে—কোন্ অজানার আহ্বানে, তখন সে তাকে পাগল বলে উপেক্ষা করতে চায়; কিন্তু পরে দেখতে পায়, যাকে সে পাগল বলেছে, সে পাগল নয়, সে-ই প্রকৃত মানব, শাশ্বত ঐশী শক্তির অধিকারী সহজ সাধনের অগ্রদূত।

কালে কালে দেশে দেশে যখন নিজের স্বরচিত ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী মহামানবতাকে ক্ষুণ্ণ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তখনই দুইএকটা পাগল সেই স্বকৃত গণ্ডী ভেঙ্গে চুরে বেরিয়ে পড়ে—যারা দেখতে পায় মানবের সহজ স্বাধীন পন্থা, যারা দেখতে পায় লোকাতীত জীবনের অসীম রহস্য মানসমুকুরে প্রতিফলিত, যারা ধরিত্রী-ধাত্রীর মায়া ছলনাময় বুঝে, প্রকৃত পিতামাতার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, রাজা রামমোহন প্রভৃতি এই শ্রেণীর পাগল।

জাতিস্মর জড়ভরত যেমন পূর্ব্বজন্মে মৃগদেহের কথা দিবারাতি স্মরণ করে সংসারের মায়ামোহ থেকে দূরে থাকতেন, এই মহামনীষিগণও তেমনি অমৃতময় ব্রহ্মলোকের কথা সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে বিস্মৃত হন না। তাঁদের মানস-দর্পণে দিনরাত প্রতিবিম্বিত হয় ব্রহ্মজ্যোতিঃ; সেই জ্যোতির অপূর্ব্ব আলোকে তাঁরা দেশকালের গণ্ডী পরিহার করে সীমার মাঝে অসীমের বাণী ঘোষণা করেন; সেই আলোকে তাঁরা মানবের সহজ দাবী মাথা পেতে স্বীকার করে নেন। সেই অপূর্ব্ব আলোকে রুগ্ন, বৃদ্ধ ও মৃতের মধ্যে মহামতি বুদ্ধ মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন; ভক্তবীর চৈতন্য সংসার পরিহার করে হরিনাম বিলোতে বিলোতে নীলাচলের পথে অগ্রসর হলেন। আর, মহাত্মা রামমোহন নিয়ে এলেন ব্রহ্মজ্ঞানের অপূর্ব্ব বাণী ধূলিধূসরিত ভারতের জীর্ণ ভগ্নকুটীরের দ্বারে দ্বারে।

রাজা রামমোহন দেখলেন, যে আলোকবর্ত্তিকা তাঁর গভীর অন্তরপ্রদেশ আলোকিত করে সংসারের উপর একটা নূতন ছায়া প্রতিফলিত করেছে, তা'ত নিজে একা একা উপভোগ করলে চলবে না; কৃপণের মত স্পর্শমণি পেয়ে লৌহসিন্ধুকে আবদ্ধ করে

রাখলে হবে না—সকলকে আহ্বান করে সে যজ্ঞের ভাগ দিতে হবে; সে উৎসব-ক্ষেত্রে সকলকে নিয়ে যেতে হবে; সকলের হৃদয়মধ্যে সহজ সাধনের ব্যাকুলতা জাগিয়ে তুলতে হবে। যে বিস্মৃতির অতলতলে তলিয়ে গেছে নিজের স্বরূপ ভুলে গিয়ে, জন্মগত সাধনের দাবী পরিহার করে যে জাগতিক পঙ্কিলতায় ডুবে আছে, তার ভুল ভেঙ্গে দিতে হবে, তাকে ধাত্রীর মায়া কাটিয়ে স্বীয় পিতামাতাকে চিনিয়ে দিতে হবে—তবেই সে জন্মগত অধিকারের দাবী নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে বিশ্বজনসমাজে; তবেই সে ধাত্রীর কোল ছেড়ে পিতামাতার অনন্ত অপরিমেয় স্নেহলাভের জন্য দু'হাত বাড়িয়ে দেবে।

রামমোহন উদাত্তস্বরে মানবের সহজ সাধনের বাণী উচ্চারণ কর্‌লেন—হে অমৃতের পুত্র! ভুলে থেকোনা তোমাদের সহজ সধানাধিকার মায়া-কুহকিনীর কুহক মায়ায়; ধাত্রীর প্রলোভনে আত্মহারা হয়ে প্রকৃত পিতামাতাকে ভুলে যেয়ো না; ওঠ, জাগ, পরমপিতার অনন্ত অপরিমেয় স্নেহকরুণার অধিকারী হও। কে আছ সুপ্ত, কে আছ নিদ্রিত, কে আছ সংসারগহন-বনে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ পথহারা, কে আছ মহাজলধির অনন্ত অতলে মজ্জমান আত্মহারা, এস, অদূরে মুক্তিপথ ব্রহ্মের করুণালোকে উদ্ভাসিত। সেই পথ ধরে পরম পিতার শান্তিশীতল স্নেহচ্ছায়ায় তাপিত প্রাণ শীতল কর্‌বে এস। যে খণ্ডকে আঁকড়ে ধরে জীবনপথে চলেছ, হে মানব, সে খণ্ড তোমাক অখণ্ডের পথে নিয়ে যেতে সমর্থ হ'বে না। নশ্বরের সেবায় আত্মনিয়োগ করে অবিনশ্বরকে লাভ করতে পারবে না। সত্যকে ছেড়ে দিয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে ত পরম পদ লাভ করতে সক্ষম হবে না। গুটিপোকার মত নিজেকে স্বরচিত শ্মশানশয্যায় ফেলে রেখোনা—নিজের জন্মগত শাশ্বত অধিকার লাভ কর; সহজ সাধনে আত্মনিয়োগ করে পরম পিতাকে জান; নতুবা নিস্তারের উপায় নেই—

> "ত্বমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
> নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

রামমোহনের অমৃতময়ী বাণী—পরব্রহ্মের উপাসনাই মানবজীবনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য, ব্রহ্মসাধনই মানবের সহজ অধিকার। জগতের যা কিছু এই উপাসনার পরিপোষক, তাই মানবের জীবনযাত্রার সহায়ক; যা উপাসনা ভুলিয়ে দিয়ে মানবকে ভিন্নপথে নিয়ে যায়, তাই অমঙ্গলজনক, তাই পরিত্যাজ্য। বৃত্তের সমস্ত ব্যাসার্দ্ধ যেমন কেন্দ্রবিন্দুতে সম্মিলিত হয়, তেমনি মানবের যা কিছু কাম্য, যা কিছু আকাঙ্ক্ষার বস্তু, অভিলষিত পদার্থ, সমস্তই ব্রহ্মোপাসনায় মিলিত হবে; ব্রহ্মোপাসনাকে কেন্দ্র করে জীবনযাত্রার পরিধি রচিত হবে; তবেই হবে অমৃতের পুত্রের উপযুক্ত কার্য্য, তবেই হবে শাশ্বত অধিকারের দাবী সার্থক।

ডিরোজিও সম্বন্ধে দু'একটী কথা।

(শ্রীদীপ্তিময় হালদার)

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন বঙ্গে কুসংস্কারে জীর্ণ হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার করিতেছিলেন, তাহার পরবর্ত্তী সময়ে অন্যদিক হইতে কয়েকজন মহাপুরুষ উচ্চ শিক্ষার দ্বারা বাঙ্গালীর সামাজিক জড়তা দূর করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এবং কাপ্তেন ডেভিড লিষ্টার রিচার্ডসনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজা রামমোহন রায় ত্রিত্ববাদ (Trinity) বর্জ্জিত প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান ধর্ম্ম অর্থাৎ ইউনিট্যারিয়ানিজম এবং মহম্মদীয় একেশ্বরবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া হিন্দুদের প্রচলিত পৌত্তলিকতা অবহেলার চক্ষে দেখিয়া বেদান্তের ভিত্তিতে সংস্কৃত হিন্দু উপাসনাপ্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। জ্ঞান ও ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া রামমোহন বাঙ্গালার জাতীয় ধর্ম্মোন্নতিবিষয়ে বহুল পরিমাণে সফলকাম হইয়াছিলেন। হিন্দু দেবদেবী পূজা ও অন্যান্য যুক্তিহীন দেশাচার প্রভৃতির উপর বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিয়া স্বাধীন ও স্বাস্থ্যকর চিন্তা দ্বারা বাঙ্গালী ছাত্রজীবনে যুগান্তর আনিয়াছিলেন জ্ঞানবাদী ডিরোজিও। হিন্দুধর্ম্মের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অ্যালেকজাণ্ডার ডাফ প্রমুখ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বড় বড় ধর্ম্মযাজকগণ সুবর্ণ সুযোগ পাইয়া পূর্ব্ব হইতেই স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মপ্রচারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় তাঁহার "Biographical Sketch of David Hare" পুস্তকে ডিরোজিও সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, সত্যের জন্য জীবন পণ করা; সমগ্র সদনুষ্ঠান প্রভৃতিতে যোগদান করা এবং সকল সৎবিষয়ের অনুশীলন করা, কোনও রকম অসৎকার্য্যে লিপ্ত না থাকা প্রভৃতি বিষয় তিনি ছাত্রদের মনে বদ্ধমূল করাইয়া দিলেন। তিনি প্রাচীন ইতিহাস হইতে সুবিচার, দেশভক্তি, দয়া, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতির উদাহরণ এমনভাবে ছাত্রদের সম্মুখে পাঠ করিতেন যে, তাহাদের মন উত্তেজিত হইয়া উঠিত। বিশ্বকবি

রবীন্দ্রনাথ ডিরোজিওর আবির্ভাবের প্রায় সত্তর বৎসর পরে বঙ্গমাতাকে প্রাণময় ছন্দে নিবেদন করিয়াছেন ;—

"পদে পদে ছোটো ছোটো নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিও না ভাল ছেলে কোরে।"

* * *

সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননি,
রেখেছো বাঙ্গালী ক'রে মানুষ করোনি।"

রবীন্দ্রনাথ বলেন "ধর্ম্মের নামে আমরা যে নিগড় গড়ি তাহা আধ্যাত্মিক মানুষকে বৈষয়িক বা পার্থিব বন্ধন অপেক্ষা কঠিনভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখে।"

সেই স্বাধীন চিন্তার শিক্ষাকল্পে অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন কিশোর কৃষ্ণমূর্ত্তি বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকে নিজেদের চারিদিকে প্রাচীর গঠন করিয়া অচলতার আশ্রয়সুখ অনুভব করে। তাহারা ছোট গণ্ডির ভিতর থাকিয়া হৃদয় ও মনের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ সব বিষয় ক্ষুদ্র করিয়া দেখে। তাহারা আসল ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের ক্ষুদ্র মতবাদরূপ পিঞ্জরে থাকিতে চায়। পিঞ্জরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া বাহিরে উন্মুক্ত স্থানে যাইবার চেষ্টা না করিয়া খালি পিঞ্জরটীকে অলঙ্কৃত করে। উন্মুক্ত স্বাধীনতা ব্যতীত প্রকৃত আনন্দ পাওয়া যায় না। যাহারা প্রভুর আজ্ঞার আওতায় বাস করে, তাহারা নক্ষত্রখচিত উন্মুক্ত আকাশ দেখিতে পায় না এবং স্বর্গীয় মলয় পবন উপভোগ করিতে পারে না।

অধিক দিন থাকিয়া হিন্দুকলেজের ছাত্রদের বিচার-শক্তির স্ফুর্ত্তিসাধন করিতে ডিরোজিও সম্পূর্ণভাবে সুযোগ পান নাই। এই অল্প সময়ের ভিতর তাঁহার জ্ঞানবাদ-মূলক মত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বাঙ্গালী ছাত্রজীবনে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। তাঁহার হিন্দুকলেজের সহিত সম্পর্ক ত্যাগবিষয়ে মনস্বী কিশোরী চাঁদ মিত্র যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ঃ—

"হিন্দু কলেজের দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ ডিরোজিওর ছাত্রদের মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপান ও নিষিদ্ধ মাংসভক্ষণের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিসন্দর্শনে বিচলিত হইয়া পড়িলেন। ছাত্রদিগের আচরণ তাঁহাদের নিকট বিষদৃশ ঠেকিল। ধর্ম্মসংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হইয়া ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপকতা হইতে অব্যা-হতি দিলেন। কিন্তু ডিরোজিও যে জ্ঞানের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, আজ তাহা বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। ইহার ফল অবশ্যম্ভাবী। পাস্কেল বলেন 'পৃথিবীর আবর্ত্তন বিষয়ে গ্যালিলিওর মত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজে কাজেই ভ্রান্ত বলিয়া জেসুইটগণ পোপের আদেশ পাইয়াছিলেন। কিন্তু সবই বৃথা। বাস্তবিকই পৃথিবী যখন ঘুরিতেছে তখন পৃথিবীর সমগ্র লোক একত্র হইয়াও ঐ আবর্ত্তন রুদ্ধ করিতে পারে না এবং পৃথিবীর আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে না ঘুরিয়া থাকিতে পারে না।' পোপ যেমন আদেশ দিলেও আবর্ত্তন থামে নাই, সেইরূপ হিন্দু কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ ডিরোজিওকে কলেজ হইতে বিদায় করিয়া দিলেও (ডিরোজিও-প্রবর্ত্তিত) নৈতিক আবর্ত্তনও থামে নাই। গঙ্গার বন্যার ন্যায় এই আবর্ত্তন সত্য ও ধর্ম্মে দেশ প্লাবিত করিয়া দিবে। উন্নতি ভগবানের নিয়ম। ক্ষুদ্র মনুষ্যের ক্ষমতা নাই তাহা রুদ্ধ করে। জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, দৃষ্টান্তসমূহ জমিয়া যায় ; ঐ দৃষ্টান্ত হইতে সাধারণ নিয়ম স্থির হয় ; সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং সন্দেহ হইলেই অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে। প্রথমে সত্যের আভাস মাত্র পাওয়া যায়। ঐ আভাস পরে মধ্যাহ্নের পূর্ণ-জ্যোতিতে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরের ন্যায়, হিন্দু কলেজের নবীন ধর্ম্মসংস্কারকদের ক্ষুদ্র দল উষার প্রথম আলোক পাইয়া সকলকে নিবেদন করিয়া-ছিলেন। আজ ঐ আলোক পর্ব্বতচূড়া হইতে নিম্ন-ভূমিতে অবতরণ করিয়াছে এবং আমি আন্তরিক আশা করি, ঐ আলোক গভীর উপত্যকা এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন ধান্যক্ষেত্রে অচিরে প্রবেশলাভ করিবে।" পাশ্চাত্য দেশে এইরূপ স্বাধীনচিন্তাশীল লোকদের উপর লাঞ্ছনার দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়। রোমের প্রধান মহন্ত মহা-রাজ পোপের শাসনে কাথলিক গির্জ্জায় স্বাধীন চিন্তার দ্বার চিরকালের জন্য রুদ্ধ। কোন রোমক চার্চ্চের অন্তর্গত ব্যক্তি কাথলিক গির্জ্জা হইতে নিঃসৃত বাইবেলের ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য অর্থ প্রকাশ করিলে তাহার জীবন রক্ষা দায় হইত ; এমন কি, রোমক খ্রীষ্টানদের কাথলিক গির্জ্জার মতদ্রোহী বা বিভিন্ন মতপূর্ণ সাহিত্যপাঠও বিপদজনক। পোপের কঠিন দণ্ড জ্ঞানবাদী লোক-দিগের উপর সর্ব্বদাই উদ্যত রহিয়াছে।

গ্যালিলিওর দুর্গতির বিষয়ে কিশোরীচাঁদ মিত্র মহা-শয়ের উদ্ধৃত অংশে আভাস পাওয়া যাইবে। Cardinal Newman তাঁহার "Apologia"তে Greek Fathers of the Churchদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের মতে আত্মরক্ষা, বদান্যতা, ধর্ম্মের সম্মান ইত্যাদি বিষয়ে অসত্য উক্তি দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। Cardinal Manning বলিয়াছেন যে, পবিত্র প্রেতাত্মার জীবন্ত উক্তি, একমাত্র পবিত্র কাথলিক এবং রোমক গির্জ্জার মতে শিক্ষাদান ও কথন ব্যতীত ইতিহাসের দোহাই দেওয়া বিশ্বাসঘাতকতার এবং ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য।

প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় এবিষয়ে রোমকদের তুলনায় অনেক পরিমাণে উদার হইলেও তাহাদের মধ্যেও ঐরূপ সঙ্কীর্ণতার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। মহাকবি

Southey অদ্বৈতবাদী এবং খ্রীষ্টধর্ম্মে অবিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া অক্সফোর্ডের Christ Church কলেজে প্রবেশাধিকার পান নাই। বিখ্যাত গণিতশাস্ত্রবিদ্ বিশপ Colenso, Old Testamentএর গোড়ার পাঁচটী পুস্তকের সমালোচনাপ্রসঙ্গে সেগুলির অনৈতিহাসিকতা স্পষ্ট প্রমাণ করাতে তাঁহার পদচ্যুতি ঘটিয়াছিল। স্বনামধন্য প্রফেসার F. D. Maurice খৃষ্টান ধর্ম্মের অনন্ত নরকভোগের মতবাদে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়া লণ্ডনের Kings Collegeএর অধ্যাপকপদ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। Magdalen Collegeএর বিখ্যাত Fellow, the Rev. J. M. Thompson যীশুর কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ এবং কবর হইতে সশরীরে পুনরুত্থান প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহারও উক্তরূপ অবস্থা হইয়াছিল। অনেকে হয় ত জানেন না মহাকবি মিলটনের গদ্যরচনা "Areopagitica" মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন চিন্তার ঘোষণা করিতেছিল বলিয়া ইংলণ্ডের Puritan Dectator Cromwell তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। Charles Darwinএর "Origin of species" মানবজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বাইবেলের বিপরীত মত প্রচারক বলিয়া কেম্ব্রিজের Trinity কলেজের পুস্তকাগারে স্থান পায় নাই। বর্ত্তমান জীবতত্ত্ববিদ্ I. B. S. Haldane পাঠদ্দশায় Hackelএর "Riddle of the Universe" নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন, এই অপরাধে তাঁহাকে Eton হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। বার্ম্মিংহামে Unitarian Dr. Priestleyর একটী পুস্তকাগার ছিল। একদিন খৃষ্টধর্ম্মে অনুপ্রাণিত জনমণ্ডলী তাঁহার উপর নাস্তিকতার দোষ আরোপ করিয়া পুস্তকাগারটী ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছিল।

Mr. Leonard তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ডিরোজিওর মৃত্যুশয্যায় জ্ঞানবাদমূলক মত প্রত্যাহার এবং খৃষ্টধর্ম্মে পুনরাসক্তি (death-bed recantation) বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। ঐরূপ অলীক ঘটনা খৃষ্টের ভক্তেরা প্রায়ই প্রচার করিয়া থাকেন। Thomas Paineএর নাম আমেরিকার জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। Paine খ্রীষ্টধর্ম্ম বিশ্বাস করিতেন না। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহাকে নাস্তিকতার অপবাদ দিয়া নির্য্যাতন করা হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরই রটিয়া গেল যে, তিনি মৃত্যুশয্যায় জ্ঞানবাদমূলক মত পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সঙ্কীর্ণ খ্রীষ্টান মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। চার্লস্ ডারউইন জীবতত্ত্বে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারও মৃত্যুশয্যায় পুনঃ খৃষ্টান হইবার অভিনব গল্প শোনা যায়। বেঞ্জামিন্ ফ্র্যাঙ্কলিন্, এব্রাহিম লিন্‌কল্‌ন, মার্ক টোয়েন, লর্ড মর্লে, জর্জ মেরেডিথ্ এবং টমাস হার্ডি প্রভৃতি মহাপুরুষগণ খ্রীষ্টপন্থী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদিগকে পাশ্চাত্য সাহিত্যে খ্রীষ্টান বলিয়া দাবী করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত ecclesiastical historian Jean Le Clerc লিখিয়াছেন যে, (খ্রীষ্ট) ধর্ম্ম সম্বন্ধে যিনি ইতিহাস লিখিবেন তিনি যেন এই অলঙ্ঘনীয় সূত্রটী মনে রাখেন যে, যাহা কিছু বিধর্ম্মীদের (অর্থাৎ যাঁহারা খৃষ্টধর্ম্ম মানেন না) ভাল তাহা মিথ্যা, যাহা কিছু তাহাদের বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারা যায় তাহা সত্য; এবং অন্য দিকে যে সব বিষয় ধার্ম্মিকদের (অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মবিশ্বাসীদের) গৌরবকর তাহা সন্দেহ করিবে না আর যাহাতে ঐরূপ ধার্ম্মিকদের দুর্ণাম হইবার সম্ভাবনা তাহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবে।

যে জ্ঞানবাদমূলক (rationalistic) মত ডিরোজিও প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন, আজ তাহারই বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ ও কৃষ্ণমূর্ত্তি এই মতের পৃষ্ঠপোষক, আগেই বলা হইয়াছে। শ্রীমতী অ্যানী বেশান্ত পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের একজন বিশেষ ভক্ত। তাঁহার প্রভাব শিক্ষিত হিন্দুসমাজে বেশ উপলব্ধি করা যায়। Madame Blavatsky কল্পিত হিমালয়ের ভ্রাতৃমণ্ডলীদের (Himaleyan Brothers) প্রতি অ্যানী বেশান্তের প্রগাঢ় ভক্তি। তিনিও জ্ঞানবাদের হাত এড়াইতে না পারিয়া কৃষ্ণমূর্ত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে কৃষ্ণজী অনেক কিছু সার উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু "সব জিনিষ বিচার করিয়া গ্রহণ করিবে" তাঁহার এই উক্তি সব উক্তির সেরা।

সর্ব্বম্ অত্যন্তম্ গর্হিতম্। Mr. Aldous Huxley একজন বিখ্যাত জ্ঞানবাদী লেখক। তিনি একবার ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে "Jesting Pilate : The diary of a Journey"তে ভারতে আধ্যাত্মিকতার বাহুল্য দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, আধ্যাত্মিকতাই ভারতের আদি অভিসম্পাৎ। তিনি এ বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাঁহারই ভাষায় উদ্ধার করা গেল;—

"A little less spirituality, and the Indians would now be free from foreign dominion and from tyranny of their own prejudices and traditions. There would be less dirt and more food. There would

be fewer Maharajas with Rolls Royces and more schools. The women would be out of prisons, and there would be some kind of polite and conventional life—one of those despised appearances of civilization which are yet the very stuff and essence of civilized existence."

আজ নববর্ষের দিনে জ্ঞানবাদের বহুল প্রচার-মানসে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনায় যোগদান করিয়া বলিতে চাই :—

"যেথা তুচ্ছ আচারের মরু-বালিরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।"

সংস্কৃত ভাষা ও প্রবেশিকাপরীক্ষা।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী)

সংস্কৃত ভাষা পুরাকালে ভারতের গৃহে গৃহে আলোচিত হইত। শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি মাত্রেই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন। এই ভাষার ব্যাকরণের বন্ধন দৃঢ়তর হইলেও স্বাভাবিক লালিত্যগুণে সকলের নিকট আদরণীয় হইত। ইতিহাস পুরাণ দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ই সংস্কৃত ভাষায় ঋষিগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের সেই অভ্যুদয়ের সময় সংস্কৃত ভাষা না জানিলে কোনরূপ শিক্ষার সম্ভাবনাই ছিল না। প্রাদেশিকভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতভাষা অধিক সমাদৃত হইত। সংস্কৃত ভাষাই প্রধানতঃ লেখ্য ভাষা ছিল ; প্রাদেশিক ভাষায় বিশেষ কিছুই লেখা হইত না। তাহার কারণ সংস্কৃত ভাষায় লিখিলে ভারতের শিক্ষিত সকল লোকই তাহা বুঝিতে পারিতেন। সংস্কৃতভাষার প্রভাব কেবলমাত্র ভারতে নহে, সমগ্র পৃথিবীতেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই সংস্কৃত ভাষা অবলম্বন করিয়া ভারতবাসী ব্রাহ্মণগণ নানা বিজ্ঞান দর্শন কৃষি ও কলাশাস্ত্রে এরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভারতের বাহিরের পণ্ডিতগণও তাঁহাদের নিকট ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য উপস্থিত হইতেন। মনু বলিয়াছেন—

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

এই দেশের ব্রাহ্মণদিগের নিকট পৃথিবীর সকল মানব নিজের চরিত্র শিক্ষা করিবে, অর্থাৎ যে সকল বিষয় জানিলে মানবচরিত্রের পূর্ণতা লাভ হয়, সেই বিষয়গুলি বিভিন্ন দেশের শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট জানিয়া লইবেন। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ ইংরাজি ভাষা না জানিলে শিক্ষার পূর্ণতা হয় না, প্রাচীন কালে সেইরূপ সংস্কৃত ভাষা না জানিলে শিক্ষার পূর্ণতা হইত না। সংস্কৃত ভাষা জানিলে অবশ্যজ্ঞাতব্য সকল বিষয় জানা যাইত বলিয়া ঐ ভাষা সকলেরই শিক্ষণীয় ছিল। কেবলমাত্র ব্যবহারিক জ্ঞানের আলোচনাই সংস্কৃত ভাষায় করা হইয়াছে তাহা নহে, সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবিদ্যা বিশদরূপে সংস্কৃত শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় কোনও ভাষায় ঐরূপ বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা হয় নাই। তাই ধর্ম্মপ্রাণ অধ্যাত্মবিদ্যার জীবনদাতা ভারতবাসীর নিকট সংস্কৃত ভাষা প্রাণ অপেক্ষাও আদরণীয় ছিল। তাঁহারা নিজের নিজের মাতৃভাষা অপেক্ষা ইহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন ; সেইজন্যই ইহার নাম ছিল দেবভাষা। ভারতের যাহা কিছু নিজস্ব তাহা ঐ সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই আছে। অষ্টাদশ মহাপুরাণ, ঊনবিংশ সংহিতা, ষড়্দর্শন, বেদ, বেদান্ত, সকলই সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা থাকিলে সহজে বুঝিতে পারা যায়। এইসকল প্রাচীন শাস্ত্রই একমাত্র ভারতের গৌরব ও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। সংস্কৃত ভাষা না বুঝিলে এবং উক্ত দর্শন-পুরাণাদি শাস্ত্র বর্জ্জন করিলে এদেশের সভ্যতার নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সেইজন্য আমরা বর্ত্তমান শিক্ষার মধ্য দিয়াও যাহাতে বালকবালিকার অন্তরে প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষার ভাব জাগরূক হয়, তাহার পক্ষপাতী। প্রাচীন শিক্ষা, প্রাচীন সভ্যতা বর্ত্তমান শিক্ষার্থী বালকবালিকাদিগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ পরিমাণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কেবলমাত্র অনুবাদাদির সাহায্যে ঐ সকল গভীর বিষয়ের যথার্থানুভব সম্ভব নহে। সে কারণেই বোধ হয় ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষা প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবশ্য পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। কয়েকজন প্রখ্যাতনামা ইংরাজ ও দেশীয় পণ্ডিত মিলিত হইয়া যে সময় এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় এদেশীয় ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ জাতিগণ বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে প্রথমত স্বীকৃত হন নাই। তাহার পর নানাবিধ প্রলোভনের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে বিদেশীয় ভাষা শিক্ষায় সম্মত

করা হয়। তাঁহাদেরই বংশধরগণ বিদেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের আচারব্যবহার ধর্ম্ম পুণ্যস্মৃতি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইবার উপক্রম করিতেছেন, ইহাই দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয়। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষাকে অবশ্য পাঠ্য তালিকা হইতে উঠাইয়া দিয়া বালকবালিকাগণের শিক্ষার পথ সহজ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাঁহারা এদেশের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে কতটা সম্বন্ধ রাখেন তাহা বলিতে পারি না। এদেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন শিক্ষার মেরুদণ্ডস্বরূপ সংস্কৃত ভাষা প্রত্যেক ভারতবাসী হিন্দু বালকবালিকাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষা এরূপ জড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে, সংস্কৃত ভাষা না জানিলে প্রাদেশিক ভাষাসমূহের বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না। আজকাল অনেক সাহিত্যিক সংস্কৃত ভাষার কবল হইতে প্রাদেসিক ভাষাগুলিকে নির্ম্মুক্ত করিবার চেষ্টায় আছেন; তথাপি সেই বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, এবং উহা সর্ব্বসম্মতও নহে। বহু প্রাচীনকাল হইতে লেখ্য সংস্কৃত ভাষার সহিত প্রাদেশিক ভাষাসমূহ এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, সে বন্ধন ছিন্ন করিলে প্রাদেশিক ভাষার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইবে। ইহা ঐ সকল খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? প্রাদেশিক ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষা দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ থাকা হেতু এদেশীয় লোকের পক্ষে সংস্কৃত ভাষা অভ্যাস করা ভিন্নদেশীয় লোকের অপেক্ষা অনেক সহজ। বাল্যকাল হইতে বালকবালিকাদিগকে কথঞ্চিৎ সুযোগ দিলে পূর্ণবয়সে নিজের চেষ্টায়ও বুদ্ধিমান বালকগণ অনেকেই সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। সংস্কৃত ভাষা না জানিলে এদেশের প্রাচীন ধারা বুঝিতে পারা যায় না। দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি পাশ্চাত্যগণ বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিলেও দর্শন-বিজ্ঞানাদির মূলগ্রন্থগুলি যে ভাষায় ঋষিগণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা না জানিলে উহার প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায়, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এদেশেরই কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা অর্জ্জন না করিয়া কেবলমাত্র অনুবাদাদির সাহায্যে ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা তাহার সম্যক্ মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন, এইরূপ অভিমান রাখেন। সেই অভিমান-বশে নানারূপ গ্রন্থ লিখিয়া দেশীয় ও বিদেশীয়লোকের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপের চেষ্টা করেন। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহারা আধুনিক শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণের প্রণীত গ্রন্থাদির সাহায্যে শাস্ত্রগ্রন্থের নানারূপ বিকৃত সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন।

সংস্কৃত ভাষা প্রবেশিকা পরীক্ষার অবশ্য পাঠ্য-তালিকা হইতে উঠিয়া গেলে উহা কেহই অধ্যয়ন করিবে, মনে হয় না। বাল্যকালে সংস্কৃত শিক্ষার বীজ হৃদয়ে রোপিত না হইলে প্রৌঢ়ে বা বার্দ্ধক্যে ঐ ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য আগ্রহ হওয়া অস্বাভাবিক।

সংস্কৃত শিক্ষার দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের কোন সুব্যবস্থা নাই বলিয়া প্রাচীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের বংশধরগণও অনেকেই অধুনা জীবিকা অর্জ্জনের উপায়স্বরূপ পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত শিক্ষা ইচ্ছাধীন হইলে অনেকেই ব্যাকরণের ভয়ে সংস্কৃত ভাষাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবে। কাজেই এখনও সামান্যভাবে জীবিকা অর্জ্জনের সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন এবং কাব্যতীর্থ প্রভৃতি উপাধি লাভ করেন, তাঁহাদের সেই সুযোগও চলিয়া যাইবে। অতএব দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা অধিক পরিমাণে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জীবিকার আশা একেবারেই অন্তর্হিত হইবে। প্রায় বিদ্যালয়েই আর সংস্কৃত পণ্ডিত রাখিবার প্রয়োজন থাকিবে না।

অতএব আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতে সংস্কৃত ভাষাকে নির্ব্বাসিত করিবার পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষগণ যেন আমাদের এই কথাগুলি একবার চিন্তা করিয়া দেখেন। যাঁহাদের উপর প্রবেশিকা-পরীক্ষার পাঠ্যনির্ব্বাচন-ভার বিশ্ববিদ্যালয় দিয়াছেন, তাঁহারা অদূর ভবিষ্যতে দেশের প্রাচীনতার ধারার মূলচ্ছেদক এই সর্ব্বনাশকর সংকল্প পরিত্যাগ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

হিন্দু আমলে ব্যবহারশাস্ত্র ও বিচার পদ্ধতি।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এল)

আমরা গতবারে বর্দ্ধমান-কৃত "দণ্ডবিবেক" গ্রন্থ হইতে কি ভাবে হিন্দুরাজগণের আমলে ফৌজদারি মোকর্দ্দমার বিচার হইত, তাহার আভাস দিয়েছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেওয়ানি মোকর্দ্দমা কি ভাবে নিষ্পত্তি হইত, তাহার আলোচনা করিব। এই বিষয়সম্পত্তি ঘটিত মোকর্দ্দমা

যাহার অবলম্বনে মীমাংসিত হইত, তাহার অপর নাম ব্যবহার-শাস্ত্র। কাত্যায়ন বলেন, 'বি' উপসর্গের অর্থ বহুতর, 'অব' উপসর্গের অর্থ সন্দেহ এবং 'হৃ' ধাতুর অর্থ দূরীকরণ; যাহা দ্বারা নানা সন্দেহ বিদূরিত হয় তাহার নাম ব্যবহার, এবং সেই শাস্ত্রের নাম ব্যবহারশাস্ত্র। সমাজরক্ষার জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ আইনেরই প্রয়োজন। মনু বলিয়াছেন "দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি" মানুষ নিদ্রিত হইলেও রাজদণ্ড জাগ্রত থাকে। অর্থশাস্ত্রই বিবাদের নির্ণয় করিয়া দেয়। ব্যবহারশাস্ত্র বলিলেই মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন, শুক্রনীতি, কৌটিল্য, ব্যবহার-মাতৃকা, মিতাক্ষরা, বশিষ্ঠ, মনুটীকা, ব্যবহারতত্ত্ব, দিব্যতত্ত্ব, দণ্ডবিবেক, বিবাদরত্নাকর, রামায়ণ, মহাভারত প্রধানতঃ এই কয়েকটিকেই বুঝায়। ইহার মধ্যে মনু সর্ব্বপ্রাচীন। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে খৃষ্টপূর্ব্ব চারিশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত রচিত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। আপস্তম্ব-স্মৃতি খৃষ্টপূর্ব্ব এক হাজার বৎসর সময়ে রচিত। উহার ভাষা বৈদিক ভাষার অনুগত। মনুসংহিতার টীকাকার মেধাতিথি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক; কিন্তু কুল্লূক ভট্ট ষোড়শ শতাব্দীর পণ্ডিত। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। মহাভারত খৃষ্টপূর্ব্ব দুই হাজার বৎসর অগ্রের; রামায়ণ তাহারও পূর্ব্বে রচিত, ইহাই অনেক পণ্ডিতের মত। উদয়নাচার্য্য খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর।

প্রাচীন কালে অধিকাংশ স্থলে মানুষের চাতুরী ছিল না। লোকে সত্যের অনুগামী ছিল। এরূপ অবস্থায় মামলা-মোকর্দ্দমার সংখ্যা অল্পই ছিল। ইংরাজি আমলের প্রমাণবিষয়ক আইনের (Evidence act) নিদর্শন হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাক্ষ্য সম্বন্ধে উক্তি আছে যে, ব্রাহ্মণ বা উচ্চপদস্থ ব্যবহারবিদের বা সদ্বংশজাত অনিন্দ্যচরিত্রের সাক্ষ্যই গ্রহণীয়। পক্ষদ্বয়ের আত্মীয়, বন্ধু, অবশ্যপ্রতিপাল্য নির্ভরশীল ব্যক্তির বা যাহার সঙ্গে বাধ্যবাধকতা আছে, তাহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য নহে। মৃত ব্যক্তির জীবিত কালের উক্তি বা লিপি পরবর্ত্তী মামলায় প্রাসঙ্গিক প্রমাণরূপে ব্যবহার হইত। ঐ উক্তি বা লিপি মৃতের স্বার্থের বিরুদ্ধ হইলে এবং সাধারণের উপকারের সহায় হইলে উহা বিশেষ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত। মৃতের পূর্ব্বপ্রদত্ত সাক্ষ্যবাক্য বা এজাহার প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হইত। আপস্তম্ব বলিয়াছেন "গ্রামেষু নগরেষু আর্য্যান্ শুচীন্ সত্যশীলান্ প্রজাগুপ্তয়ে নিদধ্যাৎ সর্ব্বতো যোজনং নগরম্ ইতি", অর্থাৎ রাজা গ্রামে নগরে প্রজারক্ষার জন্য সত্যাচারী চরিত্রবান আর্য্য অর্থাৎ পূজ্য লোককে নিযুক্ত করিবেন। মনুও বলিয়াছেন, রাজা প্রতি গ্রামে একজন অধ্যক্ষ রাখিবেন, দশ গ্রামাধ্যক্ষের উপর একজন, শত গ্রামাধ্যক্ষের উপর একজন এবং সহস্র গ্রামাধ্যক্ষের উপর একজন বিশিষ্ট অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। গ্রামের অধ্যক্ষের নিকটে দোষ মীমাংসা না হইলে তিনি দশগ্রামাধ্যক্ষের গোচরে আনিবেন; এইরূপে ক্রমে ক্রমে রাজার গোচরে আসিবে। ইহা কতকটা আপীলের মত। আপস্তম্ববচনে প্রহরী (police) নিযুক্তির কথা আছে "সর্ব্বতঃ যোজনং নগরং তস্করেভ্যো রক্ষ্যং কোষো গ্রামেভ্যঃ" অর্থাৎ সর্ব্বত্র গ্রাম-নগরাদিতে চোর হইতে রক্ষার জন্য, এবং গ্রামবাসীর নিকট হইতে ধনাগার বা রাজকোষ রক্ষার জন্য রাজা রক্ষক নিযুক্ত করিবেন। এই রক্ষকগণ প্রায়ই ব্যাধ, চণ্ডাল, শবর ও অরণ্যচরাদির মধ্য হইতে সংগৃহীত (recruited) হইত। প্রাচীন ব্যবহারশাস্ত্রে ইহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, যদি গ্রামের কাহারও বা আগন্তুক বিদেশী বণিকের কোন বস্তু বা অর্থ চুরি যায় ও চোরের সন্ধান না মিলে, গ্রামাধ্যক্ষের অনবধানতাবশতঃ ঘটিলে তিনি নিজ হইতে তাহা পূরণ করিয়া দিবেন; গ্রামাধ্যক্ষ নিঃসম্বল হইলে রাজা নিজ হইতে তাহা দিবেন। কত বড় দায়িত্ব গ্রামাধ্যক্ষের ও রাজার ছিল তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আছে "চোরহৃতম্ অবিদ্যমানং স্বদ্রব্যেভ্যো দদ্যাৎ"। বিজ্ঞানেশ্বরধৃত ব্যাসবচনে আছে "স্বকোষাৎ তৎ হি দাতব্যং অশক্তেন মহীক্ষিতা"। চোরাই বস্তু ক্রয় করা বা চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া বা চোরকে গোপন করা, চুরির তুল্য অপরাধ। যাঁহারা মৃচ্ছকটিক নাটক পড়িয়াছেন, তাঁহারা সাবেক আমলের শান্তিরক্ষকের পরিচয় পাইবেন। অনেকের মতে এই মূল নাটকের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০ বৎসরের কাছাকাছি। কালিদাস বহু পরবর্ত্তী সময়ের হইলেও তাঁহার শকুন্তলার ভিতরে নগররক্ষকের পরিচয় মিলে।

সাক্ষীকে কূট প্রশ্ন (cross examination) বা জেরা করিবার ব্যবস্থা বিশেষভাবে দেখা যায় না বটে, কিন্তু দিব্যপরীক্ষা ছিল। দিব্যপরীক্ষার কথা পরে বিবৃত হইবে। পূর্ব্বে উকীল ছিল না। কিন্তু "বাদে-নিযুক্ত" বলিয়া প্রতিনিধির উল্লেখ আছে। বাদী বা বিবাদী পীড়িত হইয়া পড়িলে তাঁহাদের অভিমত প্রতিনিধি বিচারকের সমক্ষে উপস্থিত থাকিতেন এবং এইরূপ প্রতিনিধি প্রায়ই অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ভিন্ন হইতেন না। স্ত্রীলোক, বালক, মূর্খ, পাগল ও রোগীর পক্ষে এইরূপ প্রতিনিধিনিয়োগের ব্যবস্থা আছে। ব্যবহারশাস্ত্রে "প্রাড়্‌বিবাক" বলিয়া একজনের পরিচয় মিলে। প্রচ্ছ্ ধাতু হইতে প্রাট্ শব্দের উৎপত্তি; বিবাক অর্থে বিবেচক অর্থাৎ যিনি ব্যবহারে প্রশ্নকর্ত্তা ও সত্যের নির্ণয়কারী। ইহার অর্থ বিচারক হওয়াই সম্ভব অর্থাৎ প্রাড়বিবাক অর্থে বিচারকের সহযোগী। বর্ত্তমান কালে উকীলের সাহায্যে বিচারের সুবিধা হইলেও অনেকস্থলে যে বিচারবিভ্রাট ঘটে ও সত্য যে মিথ্যায় পরিণত হয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বর্ত্তমান ইংরাজি আইনে কোন লোক ৭ বৎসর পর্য্যন্ত নিরুদ্দেশ থাকিলে তাহার যে মৃত্যু ঘটিয়াছে এরূপ ধরিয়া লওয়া হয়; কিন্তু প্রাচীন হিন্দু আইনে ১২ বৎসর নিরুদ্দেশ থাকিলে তবে সে মৃত এইরূপ অনুমিত হইত। "গতস্য ন ভবেৎ বার্ত্তা যাবৎ দ্বাদশবার্ষিকী। প্রেতাবধারণং তস্য কর্ত্তব্যং সুতবান্ধবৈঃ।" যমস্মৃতি।

যাহার সাহায্যে তথ্যের নির্ণয় হয়, তাহার নাম প্রমাণ। সন্দিগ্ধবিষয়ে দুইটি মূল প্রমাণ—(১) মানুষ ও (২) দৈবিক। মানুষপ্রমাণ অর্থে যাহা মানবের আয়ত্ত।

উহা আবার তিনভাগে বিভক্ত—(ক) সাক্ষী, (খ) লেখ্য (দলিলাদি document), (গ) ভোগ অর্থাৎ দখল (possession)। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ভোগপ্রমাণই বলবৎ। অশ্ব গবাদি জন্তু অপহৃত হইলে বা বিচারাধীন হইলে ভোগপ্রমাণই স্বতঃপ্রমাণ, অর্থাৎ বিবাদমূলক গবাদিকে ভোক্তার আদেশপালন করিতে দেখিলে বুঝিতে হইবে যে ইহা তাহারই পশু। ঐ পশুই ভোগের নীরব সাক্ষী।

চক্ষুর সাহায্যে যে অনুভব হয় তাহার নাম সাক্ষ্য। এই অনুভব যাহার আছে সে-ই সাক্ষী। যিনি প্রত্যক্ষদর্শী বা যিনি প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট শুনিয়াছেন, তিনিও সাক্ষী। তাঁহার সাক্ষ্যও প্রমাণরূপে গণ্য। "সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাৎ চৈব সিধ্যতি" (মনু), "শ্রবণাৎ শ্রাবণাৎ চাপি স সাক্ষ্যুত্তরসজ্ঞিতঃ" (নারদ)। সাক্ষী আবার পাঁচভাগে বিভক্ত। বাহুল্যবোধে তাহা লিখিত হইল না। দীর্ঘকালেও যাহার বুদ্ধি, স্মৃতি ও শ্রবণেন্দ্রিয় বিকল হয় নাই, এইরূপ ব্যক্তিই সাক্ষী হইবার যোগ্য। বাদী বিবাদী ও সাক্ষীর বাক্যগুলি যিনি লিখিয়াছেন এবং বিচারকের সহযোগী সভ্য, তাহাকে অকৃতসাক্ষী বা অনির্দ্দিষ্ট সাক্ষী বলা হইত। রাজাকে কোন পক্ষ সাক্ষী মান্য করিতে পারিত না, শাস্ত্রে এরূপ বিধান আছে; "ন সাক্ষী নৃপতিঃ কার্য্যঃ"। যে সাক্ষী বাদী বা বিবাদীর সজাতি সবর্ণ ও যথাসম্ভব গুণবান তিনিই প্রশস্ত সাক্ষী। ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ক্ষত্রিয়, রমণীর পক্ষে রমণী প্রশস্ত সাক্ষী। ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় ভিন্নবর্ণ ও ভিন্ন জাতির লোক হইলেও সাক্ষী হইতে পারিত।

প্রতি মামলায় অন্তত তিনজন সাক্ষী হওয়া চাই; তদূর্দ্ধ হইলেও ভাল হয়। ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় বাদী ও বিবাদী উভয়ের অভিমত একজন সাক্ষী হইলেও তিনি একাকী সাক্ষী হইতে পারেন। ঋণাদি ঘটিত মামলায় উভয়ের মানিত দুইজন সাক্ষী না থাকিলে বিচার হইত না। যাঁহারা তপোনিষ্ঠ, শ্রোত্রিয়, বৃদ্ধ ও সন্ন্যাসী তাঁহারা সাক্ষী, হইতে পারিতেন না। যাহারা চৌর্য্যাদি অপরাধে দোষী, যাহারা ভেদাধীন (উৎকোচে বশীভূত), যাহাদিগকে সাক্ষী মান্য করা না হইলেও, উপযাচক হইয়া সাক্ষী দেয় এইরূপ লোকের সাক্ষ্য গৃহীত হইত না। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, ধূর্ত্ত, মাতাল, পাগল, ব্রহ্মহত্যাকারী, নটবৃত্তিজীবী, জালিয়াৎ, ইন্দ্রিয়শক্তিবিহীন, পতিত, পক্ষগণের সহায়ীভূত, চোর, জ্ঞাতিগণের বিদ্বেষভাজন, ইহারাও সাক্ষী হইতে পারিত না। এতদ্ভিন্ন চিরদাস, ছলব্যবসায়ী ব্যসনাসক্ত, দীর্ঘপথগামী, সমুদ্রযাত্রী বণিক, ক্লীব, নাস্তিক, পত্নীত্যাগী, একপাত্রে অন্যের সহিত ভোজনকারী, গুপ্তচর, জ্ঞাতি, সহোদর, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, বিষবিক্রেতা, সর্পজীবী, চণ্ডাল ও ভূতাবিষ্ট, পক্ব তৈলপ্রস্তুতকারী, রাজা কর্ত্তৃক বধকল্প কার্য্যে নিযুক্ত, লোভী, কুসীদজীবী ব্রাহ্মণ, রাজসেবক, নিষিদ্ধ মাংসবিক্রেতা, তোষামোদী, পিতার সঙ্গে বিবাদকারী ইত্যাদি যাহারা, তাহারাও সাক্ষী হইতে পারিত না। তবে নরহত্যা প্রভৃতি বিচারে অন্য সাক্ষী অসম্ভব হইলে স্ত্রীলোক ও বালকের সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইতে পারিত। স্ত্রীলোক ও বালক চপলমতি এই কারণে তাহাদের সাক্ষ্যদান সম্বন্ধে বাধা শাস্ত্রপরায়ণগণ দেখাইয়াছেন। অনেক স্থানে চিহ্নই সাক্ষী। গৃহদাহে অন্য সাক্ষীর অসদ্ভাব হইলে, যাহার হাতে মসাল, সে-ই অগ্নিদাতা ইহা অবধারণ করিতে হইবে। কেননা মসালধারণই তাহার চিহ্ন। কোন লোক আহত হইলে যাহার হস্তে অস্ত্র, অস্ত্রধারণ ঘাতকতার চিহ্ন বলিয়া তাহাকে ঘাতক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। বন কাটা হইতেছে, যাহার হস্তে কুঠার সে-ই দোষী। কাহার দেহে আঘাত দেখা যাইলে যে নিষ্ঠুরভাষণ করিতেছে সে-ই অপরাধী। যদি চুরি হইয়া থাকে, তবে পদচিহ্নের অনুসরণে দোষী স্থির করিতে হইবে। বিচারালয়ে অভিযোগ থাকিলে বিচারক অনুমান দ্বারা সত্য নির্দ্ধারণ করিবেন। স্বর বর্ণ আকার ইঙ্গিত চক্ষু ও চেষ্টা এই ছয় প্রকার বাহিরের চিহ্ন দ্বারা দোষী নিরূপণ করা যাইতে পারে; যথা, "বাহ্যৈর্বিভাবয়েল্লিঙ্গৈর্ভাবমন্তর্গতং নৃণাম। স্বরবর্ণেঙ্গিতাকারৈঃ চক্ষুষা চেষ্টিতেন চ॥" মনু ৮ম. অ।

আজকাল বৃটিশরাজত্বে সাক্ষ্য দিবার পূর্ব্বে সাক্ষীকে শপথগ্রহণ করিতে হয়, পূর্ব্বে হিন্দু রাজার আমলে সেরূপ ছিল না। সাক্ষীকে দেবতা বা ব্রাহ্মণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইত। সত্যকথনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বেদ ও পুরাণের বচন আবৃত্তি করিয়া মিথ্যাভাষণের দোষ প্রদর্শন করা হইত। তাহাকে বলা হইত, 'জীবদেহের অন্তরে পরম পুরুষই পাপপুণ্যের সাক্ষী আছেন, মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া সেই সর্ব্বোত্তম নিত্য সাক্ষীর অবমাননা করিও না।" আরও বলা হইত "সত্যেন পূয়তে সাক্ষী ধর্ম্মঃ সত্যেন বর্দ্ধতে, তস্মাৎ সত্যং হি বক্তব্যং সর্ব্ববর্ণেষু সাক্ষিভিঃ॥" যদি তুমি মিথ্যা বল, তোমার অর্জ্জিত পুণ্য কুক্কুরে সংক্রমিত হইবে। তুমি মনে করিও না যে তুমি একাকী আছ। ঈশ্বর তোমার পাপপুণ্যের প্রত্যক্ষদর্শী।" ঋষিবিশেষের মতে তাহাকে আরও বলা হইত, "হে ভদ্র! সাগরবক্ষে নৌকার ন্যায় একমাত্র সত্যই জীবের স্বর্গধামের সোপান। তুলাদণ্ডের একদিকে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের সঞ্চিত পুণ্য, অপরদিকে একটিমাত্র সত্য রাখিলে, সত্যটিই গুরুভার হয়," ঈদৃশ শাস্ত্রব্যাখ্যার পরে সাক্ষীর মিথ্যাভাষণের প্রবৃত্তি একেবারেই তিরোহিত হইত।*

ADDITIONS AND CORRECTION TO THE CURRENT HISTORY OF THE BRAHMO SAMAJ.

(DR. V. RAI.)

(1) An Addition.

It is generally known that Rammohon Roy when in Calcutta had social divine service in his own house and also used to attend the unitarian service conducted at his instance by Mr. Adam whom he had converted from Trinitarianism to unitaria-

* ভাটপাড়ানিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

nism. But it is not generally knonwn that he was a regular worshiper in Dr. Bryce's Trinitarian Church. It is also not generally known that Rammohon Roy had a hand in Dr. Duff's coming out to India. The following extract from George Smith's life of Dr. Duff will give authentic information on both the points.

It was Rammohon :Roy who was the instrument of the conversion of the first chaplain, Dr. Bryce, from the opinion of the Abbe Dubois that no Hindu could be made a true christian, to the conviction that the past want of success was largely owing to the inaptitude of the means employed. Some nine years after the confession which we have already quoted, we find Dr. Bryce writing "Encouraged by the approbation of Rammohon" I "presented to the General Assembly of 1824 the petition and memorial which first directed the attention of the Church of Scotland to British India as a field for missionary exertions, on the plan that is now so successfully following out, and to which this eminently gifted scholar, himself a Brahman of high caste had specially annexed his sanction,...

"Rammohon Roy was himself a hearer in the Scotch Church of Calcutta." To the minute of st Andrew's kirk-session on the subject Rammohon Roy appended this singular testimony on the 8th December, 1823 :

"As I have the honour of being a member of the congregation meeting in St Andrew's Church (although not fully concurring in every article of the Westminster confession of faith), I feel happy to have an opportunity of expressing my opinion that, if the prayer of the memorial is complied with, there is a fair and reasonable prospect of this measure proving conducive to the diffusion of religious and moral knowledge in India." But, in reality, Dr. Bryce's scheme was one for almost everything that Duff's was not. His plan of a "Scottish College" was dictated by sectarian hostility to the Bishop's College of his rival, Dr. Middleton,"

পত্রিকাপরিচয়।

রাষ্ট্রবাণী—আমরা দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম যে, "রাষ্ট্রবাণী" পত্রিকাখানি পুনরায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশের বিপদসঙ্কুল সময়ে এইরূপ একখানি পত্রিকার খুবই প্রয়োজন আছে। ইহার ছত্রে ছত্রে দুর্নীতির প্রতিকূল এবং দেশের উন্নতি ও কল্যাণের অনুকূল যে সকল বাণী বিঘোষিত হয়, তাহার প্রত্যেকটী বর্ত্তমান সময়ে আবালবৃদ্ধবনিতা দেশবাসীর প্রণিধানযোগ্য। আমরা পবিত্রতা ও সদ্ভাবে মাখা এইরূপ পত্রিকার গৃহে গৃহে প্রচার কামনা করি।

গ্রন্থপরিচয়।

বিজ্ঞানে বিরোধ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় প্রণীত, মূল্য ।০ আনা।

আমরা উক্ত পুস্তিকাখানি প্রাপ্ত হইয়াছি। বিজ্ঞানের বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সকলেরই স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার অধিকার আছে। গ্রন্থকার এই পুস্তকে তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার স্পষ্ট ভাষণের জন্য আমরা সন্তুষ্ট। আলোকাদি সম্বন্ধে প্রকৃত আলোচনা করিতে হইলে যে সমস্ত গবেষণাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, তাহা দৃষ্টি করা আবশ্যক ; তাহা না হইলে ধন্ধা বিদুরিত হইবে না। প্রকৃতপক্ষে আলোক, উত্তাপ ও তড়িৎ বড়ই রহস্যাকর। সব রহস্য আজও ভেদ হয় নাই। সে যাহা হউক, লেখকের সহিত একমত হইতে না পারিলেও তাঁহার চেষ্টা প্রশংসার যোগ্য। চি. চ.

শ্রীমতী সরস্বতী সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী—শ্রীযুক্ত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১৮১নং ফার্ণ রোড হইতে প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীমতী সরস্বতী সেন ২৪ পরগণার অন্তর্গত থাঁটুরা-গ্রাম-নিবাসী পরলোকগত কান্তিচন্দ্র পালের কন্যা। এগার বৎসর বয়সে ইনি বিধবা হন। পনের বৎসর বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া বামাবোধিনী পত্রিকার "অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার" অধীনে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন এবং বেথুন কলেজেও কিছুদিন শিক্ষা করেন। ক্ষেত্রমোহন দত্তের উপদেশে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে :আসিয়া ইনি কিরূপে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন ও ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়াছিলেন, তাহা এই জীবনীতে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকখানি প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই পাঠ করা উচিত। ব্র. চ.

সংবাদ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছে। পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত "দণ্ডবিবেক" প্রবন্ধটী ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের "সময়" পত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর অ্যাডভোকেট।—আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, আদিব্রাহ্মসমাজের সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস-সি, বি-এল হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট হইয়াছেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যাহা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা হইতে আদিব্রাহ্মসমাজে ৬৲ ছয় টাকা দান করিয়াছেন। আদিব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার গভীর প্রীতি দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। ইহাঁর সদ্দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মসমাজ-হিতৈষীমাত্রেরই অনুসরণীয়। পরমেশ্বরে ইহার মতি চিরকাল দৃঢ়নিবদ্ধ থাকুক। ভগবান ইঁহার উত্তরোত্তর কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি বিধান করুন।

রবীন্দ্রজয়ন্তী।—গত ২৫শে বৈশাখ শুক্রবার পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ সপ্ততিবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষ্যে উক্ত দিবস প্রাতঃকালে বোলপুর শান্তিনিকেতনে বেদমন্ত্রপূত এক অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত, কলিকাতায় কবির সম্বর্দ্ধনার্থ একটী আনন্দোৎসবের আয়োজন করিবার জন্য বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট্-গৃহে স্থানীয় বিদ্বজ্জনমণ্ডলী কর্তৃক একটী পরামর্শসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই সভার নির্দ্দেশ অনুসারে আচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসুকে সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয়দ্বয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া এক কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে। ভগবান রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘজীবী করিয়া দেশের সেবায় নিরত রাখুন।

গার্হস্থ্যসংবাদ।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ।—গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার পূর্ব্বাহ্নে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রী শ্রীমনীষা দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺দিবিন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাৎসরিক মৃত্যুতিথি উপলক্ষ্যে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটের স্বকীয় বাসভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাৎসরিক মৃত্যুতিথি উপলক্ষ্যে তদীয় মধ্যম পুত্র আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোর স্বকীয় বাসভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতিমতে যথারীতি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন।

জন্মতিথি।—গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রপৌত্র শ্রীমান হৃদীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তদীয় ভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ব্রহ্মোপাসনা সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

শোকসংবাদ।

পণ্ডিত ৺লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড়।—আমরা দুঃখের সহিত অবগত হইলাম যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিতাগ্রগণ্য লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহোদয় গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে কাশীধামে স্বকীয় বাসভবনে অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইহাঁর বয়ঃক্রম মাত্র ৫৭ বৎসর হইয়াছিল। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দ্বারা ব্রাহ্মণসমাজের সংস্কারসাধনই ইহাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল; এবং শেষ পর্য্যন্ত ইহারই সংসাধনে ইনি আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহার মৃত্যুতে পণ্ডিতসমাজের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। আমরা ইহাঁর বর্ষীয়সী দুঃখিনী জননী ও শোকার্ত্ত পুত্রকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবৎকৃপায় ইহাঁর লোকান্তরিত আত্মা সাধনোচিত ধাম লাভ করুক।

৺অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি এল।—আমরা ঢাকার "শিক্ষাসমাচার" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক, ঢাকানিবাসী সুবিদ্বান ও সত্যধর্ম্মানুরাগী অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল মহাশয়ের গত ২৬শে বৈশাখ শনিবার অকালে পরলোকগমন-সংবাদে মর্ম্মাহত হইলাম। অবিনাশ বাবুর সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়লাভের সুযোগ না হইলেও "শিক্ষাসমাচারে" তাঁহার উদারতা ও গুণগ্রাহিতার বিশেষ পরিচয় পাইতাম। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে তিনি বিশেষ প্রীতিদৃষ্টিতে দেখিতেন এবং ইহা হইতে বহু প্রবন্ধ তাঁহার শিক্ষাসমাচারে উদ্ধৃত হইত। সেই সূত্রে তাঁহার সহিত আমরা একটী প্রীতির যোগ অনুভব করিতাম। তাঁহার শোকার্ত্ত পরিজনবর্গকে আমাদের প্রগাঢ় সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইহাঁর পরলোকপ্রস্থিত আত্মাকে আপন স্নেহাশ্রয় প্রদান করুন।

ওঁ তৎসৎ
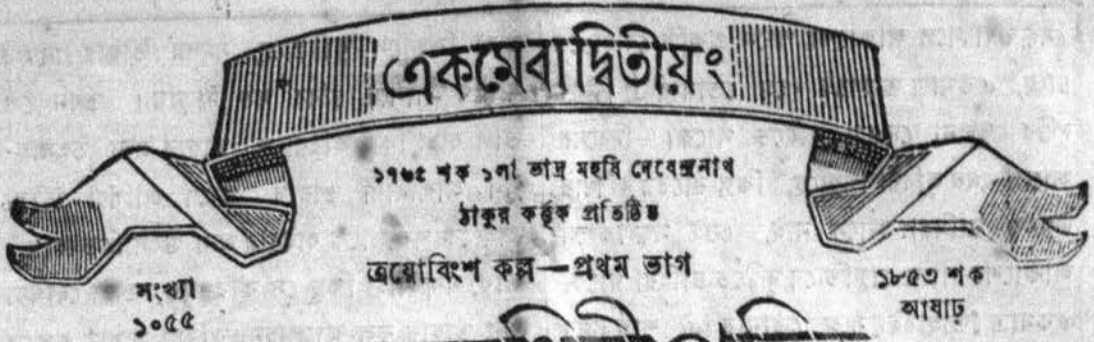
১৭৬৫ শক ১৭ই ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ত্রয়োবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ

সংখ্যা ১০৫৫

১৮৫৩ শক আষাঢ়

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৭৩। দুঃখের গান।

মা! আমি যখন গান গাহিতে যাই, তখন অন্তরে দুঃখই উদ্বেলিত হইয়া উঠে—সুখের কথা কোন্ সুদূরে পড়িয়া থাকে, মনেই আসে না। গানগুলিও যখন দুঃখে ভরিয়া উঠে, তখনই সেই গানগুলি যেন ভাল করিয়া ফোটে। তোমার দিকে চাহিয়া যখন সেই গানগুলি কাতরকণ্ঠে গাহিয়া তোমাকে শোনাই, তুমি তখন ছুটিয়া আসিয়া আমায় কোলে তুলিয়া কত-না সান্ত্বনার কথা বল, কত-না আদরে স্নেহে আমার চোখের জল মুছিয়া দাও। কিন্তু সুখের সুরে যখন গান রচনা করি, তখন তো তুমি এমন করিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমায় কোলে তুলিয়া লও না। বরঞ্চ মনে হয়, যখন সুখের গান গাহিতে থাকি, তখন তুমি এক পা এক পা করিয়া দূরে সরিয়াই যাও। তাই ইচ্ছা হয়, আমার সকল কাজ ফেলিয়া দুঃখের সুরেই গান রচনা করি, আর আমার প্রাণের দুঃখের কথায় সেই গানগুলি ভরিয়া দিই। মা! বড় দুঃখ হয়, যখন গাহিতে গিয়া দেখি, আমার কণ্ঠবীণার তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ছেলে-বেলায় তোমার আশীর্ব্বাদে কি সুকণ্ঠই না পাইয়াছিলাম। সেই কণ্ঠ হইতে যখন গানের সুর আকাশে পরতের পর পরত ভেদ করিয়া উঠিত, তখন তাহা তুমি যেখানেই থাকিতে তোমাকে সেখান হইতে খুঁজিয়া বাহির করিত। কিন্তু আজ এই কণ্ঠ হইতে আর তেমন জোরে গান বাহির হয় না। গান গাহিব কি—গান গাহিতে গেলেই অক্ষমতার অশ্রু উছলিয়া উঠে। এখন আমার প্রাণের গুণ গুণ তোমার প্রাণে আপনা হইতেই ধাক্কা দেয়, তাই তুমি আপনিই ছুটিয়া আস; তুমি নিজে ধরা না দিলে আমিতো আর ধরিতে পারি না। আমি গান গাহি বা না গাহি, আমার এই ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে গান বাহির হউক বা না হউক, তুমি দয়া করিয়া আমায় মাঝে মাঝে বারেকের জন্যও কোলে লইয়া আদর করিও, আমার চোখের জল মুছিয়া দিও, আমার মনপ্রাণ সবল করিয়া তুলিও।

৭৪। মাতার দৃষ্টি।

মা! তোমার ঐ স্নেহে ভরা চাহনি কি সুন্দর! নিশীথের অন্ধকার যখন ঘুচিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রভাতের আলো তখনও ফুটিয়া উঠে নাই,

সেই উষাকালে আকাশের পানে প্রকৃতি যে দৃষ্টিতে চাহে, একমাত্র তাহারই সঙ্গে তোমার ঐ স্নিগ্ধ-দৃষ্টির তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। দিবসের আলো যখন ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাতের আঁধার তখনও নামিয়া আসে নাই, সেই সন্ধ্যাকালে আকাশের পানে প্রকৃতি যে দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, একমাত্র তাহারই সঙ্গে তোমার ঐ শান্তদৃষ্টির তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। চন্দ্রতারা যে দৃষ্টিতে সারা নিশি জগতের উপর চাহিয়া থাকে, একমাত্র তোমারই অনিমেষ মঙ্গল দৃষ্টিতে তাহার তুলনা পাইয়া মুগ্ধ হই। শতবিধ কর্ম্মের তরঙ্গে পড়িয়া তোমার ঐ দৃষ্টির উপর আমার দৃষ্টি সকল সময়ে স্থির রাখিতে পারি না। কিন্তু সময়ে সময়ে এক আধবার ঐ শান্তস্নিগ্ধ মঙ্গল দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টি পড়ে, তখনই ভবসাগরের ভীষণ তরঙ্গসকল কি আশ্চর্য্য রকমে শান্তভাব ধারণ করে—সমস্ত বিপদআপদ মুহূর্ত্তের মধ্যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। মা! তুমি তোমার ঐ স্নেহদৃষ্টিতে আমাকে তোমার বুকের কাছে টানিয়া কি আশ্চর্য্য-ভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাও, আবার কর্ম্ম সারা হইলে কি আশ্চর্য্যভাবে আমাকে তোমার বুকের কাছে টানিয়া আমার শ্রমজনিত সকল দুঃখকষ্ট, সকল জ্বালাযন্ত্রণা নিমেষের মধ্যে ঘুচাইয়া দাও, তাহা তুমিই জান। যদি কখনও আমি তোমা হইতে দূরে সরিয়া যাই, তবে আমার উপর তোমার ঐ স্নেহপূর্ণ মঙ্গল দৃষ্টি ফেলিয়া ফিরাইয়া আনিও। সংসারের বিষকণ্টকে আহত হইয়া যখন জ্বালা-যন্ত্রণায় বড়ই ছটফট করিতে থাকিব, তখন তুমি আমাকে কোলে লইয়া সুনির্ম্মল স্তন্যদানে আমার বল ও পুষ্টিবিধান করিও এবং আমার সর্ব্বাঙ্গে তোমার স্নেহহস্ত বুলাইয়া জ্বালাযন্ত্রণা নির্ব্বাণ করিয়া দিও।

১৩। জীর্ণ তরী।

মা! আজ প্রভাত হইতে না হইতে টিপি-টিপি জল পড়িতেছে। আমারও প্রাণের উপর কি এক অজানা ঘন বিষাদ চাপিয়া পড়িয়াছে। লোকে বলে, মানুষ যখন ইহলোক ছাড়িয়া পর-লোকে চলিবার পথে দাঁড়ায়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাহার ইহলোকের সমুদয় ক্রিয়াকলাপ, ভালমন্দ যাহা কিছু সে করিয়াছে, সমুদয় তাহার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া ছবির মত দাঁড়ায়। তখন সে ভাল যাহা কিছু করিয়াছে, তাহার জন্য উৎসাহ-পূর্ণ আশাবাণী তাহার প্রাণে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে পরলোকে যাইবার জন্য উৎসাহিত করে; আর, মন্দ যাহা কিছু সে করিয়াছে, তাহা দেখিয়া এবং তাহার ফল আলোচনা করিয়া তাহার অন্তরে যদি অনুশোচনা আসে, তবে সেই অনুশোচনার অশ্রুজলে তাহার সেই সমস্ত বিধৌত হইয়া যায় এবং সে পরলোকে নির্ম্মল হৃদয়ে অগ্রসর হইবার জন্য সহজে প্রস্তুত হয়। আমারও মনের সম্মুখে আজ আমার সারাজীবনের ভালমন্দ সমস্ত কর্ম্মই ছবির আকারে দাঁড়াইয়াছে। ভাল কাজ যাহা কিছু করিয়াছি, সে সমস্তই তুমি জান। মন্দ কাজ যাহা কিছু করিয়াছি, তাহারই ফল আলোচনা করিয়া অনুশোচনায় আমার প্রাণ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কি সুন্দর দেহ দিয়াছিলে—যেথান দিয়া যাইতাম, চারিদিকে আনন্দের তরঙ্গ উঠাইয়া চলিতাম; কি সুন্দর মন দিয়াছিলে, বারেকের জন্য যাহা কিছু আলোচনা করিতাম তাহাই যেন পুরাতন হইয়া যাইত। কিন্তু এখন—দেহখানি তো শতচ্ছিদ্র জীর্ণতরী হইয়া গিয়াছে; নিজের দেহ দেখিয়া নিজেরই উপর ঘৃণা ও ধিক্কার আসে—ইচ্ছা হয়, নিজের হৃদয় স্বহস্তে উৎকীর্ণ করিয়া তোমার হাতে সমর্পণ করি, আর তোমারই কোলে সমস্ত জ্বালা ভুলিয়া চির-নিদ্রায় ভুলিয়া থাকি। আমার মনে নূতন কোন কিছুই আনন্দ দিতে পারে না—মনপ্রাণ সমস্তই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। একমাত্র তোমার নাম, তোমার ধ্যানই আমার হৃদয়ে যেটুকু শান্তি আনে, আনন্দ আনে। অনুশোচনায় প্রাণ যে গেল—দিন-রাত অশ্রু ঝরিতেছে, তবুও তো তাহার অন্ত পাই না। মলয় বাতাস যখন ঝুরুঝুরু বহিতে থাকে, গাছপালা যখন বাতাসের সঙ্গে গ্রীবাভঙ্গ সঙ্গে আনন্দে খেলা করিতে থাকে, তখন আমি তাহাদের সেই আনন্দে যোগ দিতে পারি না বলিয়া অশ্রু বন্যার আকারে উদ্বেলিতবেগে ছুটিতে থাকে। সূর্য্যের আলো, চন্দ্রের আলো, কিছুই সহ্য হয় না। ইচ্ছা হয় তোমার চরণে যত কিছু অপরাধ করিয়াছি

মাটীর উপর উপুড় হইয়া মুখ গুঁজিয়া দিনরাত কাঁদিতে থাকি আর তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি—যত দিন না তুমি মুখ ফুটিয়া আমাকে বল যে, আমাকে ক্ষমা করিয়াছ। এই রকম কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমি মৃত্যুমুখে পড়ি, তাহাই কি তোমার ভাল লাগিবে? আগে যেমন একটুখানি কাঁদিয়া ডাকিলেই তুমি ছুটিয়া আসিতে, কোথায় ব্যথা লাগিল জিজ্ঞাসা করিতে, এবং তোমার সঞ্জীবন-মন্ত্রে মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত ব্যথা দূর করিয়া দিতে, আজ তুমি সেই রকম একবার আসিয়া তোমার এই দুঃখকাতর সন্তানকে কোলে তুলিয়া লও, অশ্রুবারি মুছিয়া দাও, আর এই ভাঙ্গা জীবনে যদি পার তো নবজীবনের এক-আধটু ছিটাফোঁটা দিও।

৭৭। সন্ধ্যায়।

মা! তুমিই তো আমাকে এই পথের এক-ধারে বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছ। এখন আমি ধুলোকাদা লইয়া একটুখানি খেলা করিতেছি বলিয়া আমাকে ভুলিয়া যাইও না। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আমার প্রাণে বড়ই আতঙ্ক জাগিয়া উঠিতেছে। আমি পথও চিনি না, আর তুমি ছাড়া আমাকে পথ দেখাইবারও কেহ নাই। জন্ম অবধি তোমারই সঙ্গে ঘুরিয়াছি ফিরিয়াছি। কখনও বা তুমি যেখানে রাখিয়া গিয়াছ, তাহা হইতে দূরে গিয়া কাঁটার বনে গিয়া পড়িয়াছি। কাঁটার আঘাতে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছি, রক্তাক্ত দেহে বাহির হইয়াছি। তখন তুমি আমার কান্না শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার সমস্ত রক্ত মুছিয়া দিয়াছ, আর কি এক যাদুমন্ত্রে সমস্ত ব্যথা দূর করিয়া দিয়াছ। কাঁটার বনে কত ভীষণ শ্বাপদ-সকল আমাকে ভয় দেখাইয়াছে, কতবার তাহাদের নখদন্তের আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু ঐ যে তোমার শান্তস্নিগ্ধ মুখ—উহাই আমার প্রাণে নিত্য জাগ্রত থাকিয়া নিত্য অভয় দান করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের শত বিভীষিকার মধ্যেও তোমার অভয়মূর্ত্তি জাগিয়া আমাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আমি খুব স্পষ্ট জানিতাম যে, উহারা আমাকে যতই কেন আঘাত করুক না, আমাকে প্রাণে মারিবার শক্তি উহাদের নাই। মা! উহারা আমাকে মারিতে না পারিলেও আমি উহাদের আঘাত সহ্য করিতে পারি না। আমি বড়ই দুর্ব্বল। আমাকে তুমি কোলে তুলিয়া বাঁচাও। কোলে না লও, আমাকে তোমার চরণের ধুলো হইয়া ঐ চরণের এক কোণে একটু-খানি দাঁড়াইবার স্থান দিও। তোমাকে যখন সকলে পূজা দিবে, আমিও তখন তাহাদের সেই পূজায় গোপনে যোগ দিয়া অনুপম আনন্দ লাভ করিব। আমার সকল ভালবাসা দিয়া কুসুমরচনা করিব, আর প্রতিমুহূর্ত্তে নিত্য নব পুষ্পে তোমার চরণপূজা করিব—তুমি জান বা নাই জান। যখন তোমার মনে পড়িবে, তখন অন্তত একবার আমায় কোলে লইয়া একটুখানি আদর করিও।

মৃত্যুর পরে।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(ক) কাল ও মৃত্যু

১। কালের তত্ত্ব দুরবগাহ্য।

দিনের পর দিন চলিয়া যায়, মাসের পর মাস চলিয়া যায়, এইরূপে একএকটি বৎসরও কাটিয়া যায়। একটি বৎসর যখন কাটিয়া গেল, তখন আমরা জানি ও বলি যে, উহা কাল-পারাবারে নিলীন হইয়া গেল। এই নিলীন হওয়ার অর্থ যে কি, তাহা কথায় ব্যক্ত করা তো দূরে থাক, ভাবিতে গেলেও মাথা ঘুরিয়া যায়; মন তাহা মনন করিতে অসমর্থ হইয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। এই কাল কোথা হইতে আসিল আর কোথায় বা চলিয়া গেল; কত লক্ষ কোটি যুগযুগান্তর যে কাল-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কে-ই বা তাহা বুঝিতে পারে, আর কেই বা তাহা বুঝাইতে পারে? তাহার জ্ঞান একমাত্র কালের স্রষ্টা, কিন্তু কালের অতীত মহাকাল পরম পুরুষেরই অন্তরে নিহিত আছে।

২। কাল ও স্থানের প্রভেদ।

দার্শনিকদিগের কেহ কেহ বলেন বটে যে, ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা বিভাগসূত্রে আমরা কালকে জানিতে পারি, অনুভব করিতে পারি; কিন্তু কালের অস্তিত্বই না থাকিলে আমরা বিভাগসূত্রেই বা তাহার অস্তিত্ব অনুভবে আনিতে পারি কি প্রকারে? কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক স্থান ও কালের অভেদ, অন্তত

আপেক্ষিক ঐক্য প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই উভয়কে পরস্পরের আপেক্ষিকত্বের তৌলদণ্ডে পরিমাপ করিয়া আপেক্ষিকত্বের ভাষায় ব্যক্ত করিবার চেষ্টা সফল হইলেও হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের প্রকৃত অভেদ আমাদের সহজ বুদ্ধিতে বোধগম্য হয় না। স্থানকে আমরা স্থান-পারাবারে প্রকৃতপক্ষে নিলীন হইতে দেখি না। উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে একই স্থানে আমরা একবার ছাড়িয়া দশবার উপনীত হইতে পারি। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে যে কাল অতীত হইয়া গেল, তাহাকে সত্যই বিশাল কালসাগরে নিলীন হইতে দেখি—সহস্র চেষ্টাতেও তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারি না; সেই অতীত মুহূর্ত্তে কিছুতেই পৌঁছিতে পারি না। যে কাল অতীতে নিলীন হইয়া গেল, বলিতে গেলে সে কাল আমাদের দৃষ্টিতে সত্যই মৃত্যু-মুখে পতিত হইল।

৩। কাল ও মৃত্যু।

আশ্চর্য্য এই যে, এই কালের মৃত্যুর সঙ্গে প্রত্যেক প্রাণীরই মৃত্যু বিজড়িত; কালেরও প্রতি মুহূর্ত্ত যেমন অতীত হইয়া মৃত্যুমুখে পড়িতেছে, আমাদেরও জীবনের মুহূর্ত্তগুলিও সেইরূপ একে একে মৃত্যুমুখে পড়িয়া অতীতের গর্ভে বিশ্রাম লাভ করে।

কালের সহিত মৃত্যুর এই সম্বন্ধ অন্য কোন প্রাণী বুঝিতে পারে কিনা জানি না; কিন্তু মানুষ কালের প্রকৃত তত্ত্ব না জানিলেও, কালের সহিত মৃত্যুর এই সম্বন্ধ যে জানে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। সে জানে যে, কালের একএক মুহূর্ত্ত অতীতে হইতেছে, আর তাহার জীবনেরও এক এক মুহূর্ত্ত সেই সঙ্গে মৃত্যু-পথের পথিক হইতেছে। এইরূপে একএক মুহূর্ত্তে মৃত্যু হইতে হইতে যখন তাহার ইহলোকের কার্য্য শেষ হইয়া যায় এবং যখন সে ভগবানের আহ্বানে ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তখনই সেই মৃত্যু-মুহূর্ত্তকেই আমরা সকলে প্রকৃত মৃত্যু বলিয়া অভিহিত করি।

(খ) মৃত্যু অমৃতসোপান

৪। মৃত্যুতে।

মৃত্যুকালে মানুষ ভাবিয়া আকুল হয় যে, সে তাহার প্রিয়জন এবং তাহার হাতে গড়া সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কার্য্য-সকল ফেলিয়া কোন্ অজানা অদৃশ্য রাজ্যে চলিয়াছে—তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কে তাহার দেহ-বস্ত্রখান খসাইয়া লইতেছে। তাহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরাও আকুলিতচিত্তে চিন্তা করে যে, এই মুহূর্ত্ত যাহার নিকটে তাহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর পাইতেছিল, যাহার মুখে ও কার্য্যে স্নেহ ও প্রেমের সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল, ঠিক পরমুহূর্ত্তে তাহার দেহ-যষ্টিখানি পূর্ব্বেও যেমন ছিল ঠিক তেমনই পড়িয়া রহিল, কিন্তু তাহা হইতে ডাকের আর সাড়া পাওয়া গেল না, শত চেষ্টাতেও পূর্ব্বের ন্যায় তাহার নিকটে স্নেহ-প্রেমের কোনই পরিচয় পাওয়া গেল না। সেই দেহযষ্টির ভিতরে এমন কে একজন ছিল, যাহার অভাবে সংসারে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, আত্মীয়স্বজন সকলেই শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল?

৫। মৃত্যুতে আত্মসন্ধান।

এইরূপে মানুষ যখন তাহার চারিদিকে একএকটি করিয়া অনেকগুলি মৃত্যু সংঘটিত হইতে দেখিল, মানব-হৃদয়ে মানব-জীবনের অসারতা ততই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। তাহার ফলে ক্রমে মানুষের অন্তরে এই অনুসন্ধান জাগিয়া উঠিল যে, এই দেহের মধ্যে কে অবস্থিতি করিয়া দেখা, স্পর্শ করা, শোনা, মনন করা ও জানা, এ সমস্ত কার্য্য করে, এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পর মুহূর্ত্ত অবধি কাহার অভাব হইল যে, তাহার নিকট হইতে ঐ সকল কার্য্যের একটিরও সাড়া পাওয়া যায়?

৬। মৃত্যুতে পরমাত্মসন্ধান।

মানুষ এই চিন্তা হইতে আরও গভীরতর চিন্তারাজ্যে গিয়া ভাবিতে লাগিল যে, এই দেহের অন্তরে দ্রষ্টা শ্রোতা প্রভৃতিরূপে যে-ই কেন ছিল হোক না, সে যখন নিজের ইচ্ছাতে এই দেহ অবলম্বনে এই পৃথিবীতে আসেও নাই এবং নিজের ইচ্ছাতে এই পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতেও চাহে নাই, তখন সে কাহার আদেশেই বা আসিয়াছিল, আর কাহার আদেশেই বা চলিয়া গেল? এই প্রকারে মৃত্যুবিষয়ক চিন্তা মানুষকে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কেবলমাত্র আত্মসন্ধানে প্রবৃত্ত করে নাই, কিন্তু আত্মার ভিতর দিয়া পরমাত্মসন্ধানেরও পথ দেখাইয়া দিল।

৭। মৃত্যু অমৃত সোপান।

ইহার ফলে মানুষ অধ্যাত্মরাজ্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গেল। কেবল অধ্যাত্ম রাজ্যের কথাই বা বলি কেন, এই মৃত্যু এবং তাহার নিবারণের উপায়বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে শারীর বা বহিঃপ্রাকৃতিক এবং মানস বা অন্তঃপ্রাকৃতিক, এই উভয় রাজ্যে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে সে অনেক দূর অগ্রসর হইল। এক কথায়, মৃত্যুর ফলে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের রাজ্যে প্রবেশ করিবার পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল—মানুষ অমরণধর্ম্মা হইবার অধিকারলাভের পথে চলিল। এই কারণে আমরা কবির সহিত এক হৃদয়ে বলিতে পারি "মৃত্যু যে, যে অমৃত-সোপান"। মৃত্যু যে প্রকৃতই অমৃত-সোপান এবং মৃত্যুর ভিতর দিয়া যে, সত্যই জীবন লাভ করা যায়

তাহা কঠোপনিষদের যমনাচিকেত-সংবাদে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।

৮। মৃত্যু নিশ্চিততম বস্তু।

মৃত্যুই আমাদিগকে অমরণধর্ম্মা করিবার পক্ষে সর্ব্ব-প্রধান সহায়, এবং সর্ব্ববিধ উন্নতি ও মঙ্গলের কারণ বলিয়াই ভগবানের মঙ্গল বিধানে মৃত্যু জগতে সর্ব্বাপেক্ষা নিশ্চিততম বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমরা অকারণে এই মৃত্যুরই ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠি। মৃত্যু আমাদিগকে চারিদিকেই ঘিরিয়া আছে। আমাদিগের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, আমরা কোন রকমে উহার হাত এড়াইয়া যাইতে পারি। মৃত্যুর পরে অপর কোন লোকে আমাদের জন্মগ্রহণ করিতে হইবে কি না এবং হইলেও কে কোন্ লোকে জন্মগ্রহণ করিবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট মতদ্বৈধ থাকিলেও মৃত্যুর অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারে না; প্রত্যেক প্রাণীকে যে মৃত্যুর কবলে কোন না কোন সময়ে পড়িতে হইবে, ইহা ধ্রুব সত্যরূপে সকলেই জানে।

(গ) ভগবানের রাজ্যে বিনাশ নাই।

৯। মৃত্যু—জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ ও নববস্ত্র পরিধান।

গীতা মৃত্যুর একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়াছেন—জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান। অন্য কোন ভাষায়, অন্য কোন দেশের কোন গ্রন্থে ইহার পূর্ব্বে মৃত্যুর স্বরূপ এমন সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া জানি না। সংজ্ঞাটি খুবই ঠিক। সেই মহাপ্রাণ হইতে এক কণামাত্র প্রাণ লইয়া এই অসংখ্য অসংখ্য মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে; তন্মধ্যে কে কোন্ লোকের উপযুক্ত আকার ধারণ করিয়া কোন্ লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে বা করিবে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা গীতার সঙ্গে একবাক্যে এইটুকু বলিতে পারি যে, মৃত্যুর পরে আত্মা ইহলোকের জীর্ণদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গিয়া তথায় বিচরণ করিবার উপযুক্ত নবতর দেহ ধারণ করিবে নিঃসন্দেহ। সেখানেও সেই মহাপ্রাণ হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারিব না—সকল প্রাণের উৎস সেই মহাপ্রাণের ক্রোড়েই এখানকার ন্যায় সেখানেও বাস করিতে থাকিব।

১০। দেহের বিনাশ হয় কি না?

মৃত্যুতে আমাদের দেহ যে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়, তাহাও নহে—বিধাতার রাজ্যে বিনাশ বলিয়া কোন কিছু স্থান পাইতে পারে না। এই শরীর ধ্বংস হইল, ইহার পরমাণু-সকল বিশ্লিষ্ট হইল, কিন্তু তাহা চিরকালের জন্য নহে। দেখা যায়, সময়ান্তরে সেই সকল পরমাণু বিভিন্ন আকারে সংসৃষ্ট ও সংহত হইয়া নবতর কোন কিছুর জন্মদানে প্রবৃত্ত হইল।

১১। আত্মা কি?

ইহা ব্যতীত অতীন্দ্রিয় ব্যাপারের বিষয় আলোচনা করিয়া যতদূর বোঝা যায়, তাহাতে মনে হয় যে, মৃত্যুর পরেও মানবদেহের পরমাণুসকলের সূক্ষ্মতত্ত্বসকল সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়া একটা কোন কিছুকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে। বায়ু যেমন কুসুমাদি হইতে গন্ধ লইয়া যায়, সেইরূপ মৃত্যুকালে পূর্ব্বশরীরের ভাবসকল নবতর অন্য ভাবসমূহের সহিত মিলিত হইয়া এক নবতর শরীরের জন্মদান করে, এবং এই নবতর শরীর একটা কোন কিছুকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠে। সেই কোন কিছুই হইল আত্মা।

দেহস্থিত ইন্দ্রিয়সকলের মৃত্যু প্রকৃত মৃত্যু নহে। আমরা অন্তরের নিভৃত প্রদেশে উপস্থিত হইয়া আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব যে, কি বহিরিন্দ্রিয় কি অন্তরিন্দ্রিয় মন, এই সকলকেই পরিচালনা করিবার জন্য আর একটি কিছু আছে, যাহা এই সকলের ভিতর দিয়াই বাহিরের ও ভিতরের সকল কার্য্যই করিয়া থাকে, অথচ সেই সকল কার্য্য হইতে এবং সেই সকল কার্য্য করিবার ইন্দ্রিয়গণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; সেই কোন-কিছুই হইল আত্মা।

১২। আত্মার বিনাশ নাই।

এই শরীরের যখন বিনাশ রহিল না, তখন এই শরীর পরিধিরূপে যাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, যে আত্মা ইহার কেন্দ্রস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া ইহাকে মননাদি শতবিধ কার্য্যে নিয়োজিত করে, একমাত্র যাহার ইচ্ছাই ইহাকে পরিচালিত করিয়া আসিয়াছে, এই দেহের বিশ্লেষণমূলক পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বা চিরস্থায়ী "আমি"র যে বিলোপ হইতে পারে না, তাহা বোধ হয় নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে।

১৩। আত্মার অবিনশ্বরত্বের অনুভূতি।

আমাদের শেষ যে কোথায়, ইহলোকে থাকিয়া তাহা তো জানিতে পারি না-ই; মৃত্যুর পরে কখনো যে তাহা জানিতে পারিব, তাহাও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আমাদের শেষ কোথায় তাহা জানিতে না পারিলেও আমাদের শক্তি ও সামর্থ্যের অতিরিক্ত ইচ্ছা ও চেষ্টা হইতে এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাঁচিবার ইচ্ছা হইতে আমাদের আত্মাতে প্রতিভাত হয় যে, মৃত্যুর পরে আত্মার বিনাশ নাই। অনেকে বলেন, আত্মার অবিনশ্বরত্ব উপলব্ধি করা আমাদের শক্তির অতীত। আমরা কিন্তু তাহা বলি না। মৃত্যুর পরে আত্মা কোন্

আকার গ্রহণ করিবে বা কি অবস্থায় থাকিবে, তাহা আমাদের সম্যক্ উপলব্ধির বিষয় না হইলেও, পূর্ব্বোক্তরূপ ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিবার কারণে বোধ হয় ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব থাকিবে, দেহ ভস্মীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও ভস্মীভূত হইবে না।

১৪। কার্য্যের কর্ত্তারূপে আত্মার উপলব্ধি।

জগৎ আমরা যেরূপ প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করি, মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব শত চেষ্টাতেও হয়তো সে ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব না; কিন্তু যে ভাবে আমাদের আত্মাকে দর্শন স্পর্শন প্রভৃতি কার্য্যের, চিন্তা ও মনন প্রভৃতি কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া উপলব্ধি করি, মৃত্যুর পরে সেভাবে অর্থাৎ কার্য্যের কর্ত্তারূপে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার কোন কারণ দেখি না।

১৫। প্রকৃতি অবলম্বনে আত্মার উপলব্ধি।

আমরা প্রকৃতি অবলম্বনেই প্রকৃতির যাহা কিছু বিচার-আলোচনা করিবার অধিকার লাভ করিয়াছি। প্রকৃতির অতীত হইয়া প্রকৃতির কোন কিছু আলোচনা করিবার অধিকার পাই নাই। ভগবানের মঙ্গল বিধানে আমরা প্রকৃতিতে দেখি যে, ক্ষুধা দূর করিবার জন্য অন্নের ব্যবস্থা আছে, তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য জলের ব্যবস্থা আছে; তখন আমরা ইহা কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারি না যে, যে ইচ্ছাশক্তি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমাদিগকে উন্নতির পথে আকর্ষণ করিতে বিরত হয় না, মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে যে অদম্য তীব্র জ্ঞানপিপাসার শেষ হয় না, এবং যে স্নেহ-প্রেম-ভক্তি-ভালবাসার বিরতি হয় না, সেই ইচ্ছাশক্তি, সেই জ্ঞান-পিপাসা, সেই স্নেহ-প্রেম প্রভৃতি উপযুক্ত পাত্রে ও ক্ষেত্রে নিয়োগ করিয়া শান্ত করিবার অবসর ইহ-লোকে যদি বা না পাওয়া যায়, মৃত্যুর পরে লোকান্তরে প্রকৃতির নিয়মেই আমরা সেই অবসর যে প্রাপ্ত হইব, তাহা খুবই সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারি; এবং তাহা হইলে, ঐ ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতির উৎস আত্মারও মৃত্যুর পরে অস্তিত্ব স্বীকার করা অসঙ্গত নহে। আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, যে সকল ইচ্ছা, জ্ঞান-পিপাসা, ভক্তি বা প্রেম এ লোকে সার্থক হইবার অবসর পায় নাই, লোক-লোকান্তরে, জন্ম হইতে জন্মান্তরে, সে সকল কেবল যে পরিতৃপ্তি লাভ করিবে তাহা নহে, পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চিরবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, এবং আমাদিগকে উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় পরিচালিত করিতে থাকিবে।

(ঘ) মৃত্যু জীবনের উৎস।

১৬। মৃত্যুর পরে প্রশস্ততর কর্ম্মক্ষেত্র।

আমাদের ক্ষণভঙ্গুর দেহের কারণে আমরা আমাদের প্রত্যেক চিন্তায় ও কার্য্যে সীমার বাধা প্রাপ্ত হই। শক্তির অতিরিক্ত চিন্তা করিতে গেলে মস্তিষ্ক নিস্তেজ হইয়া যায়, এবং ক্ষমতার অতিরিক্ত ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে গেলে শরীর ভাঙ্গিয়া যায়। আমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত এই প্রকার ইচ্ছা ও চেষ্টার অস্তিত্ব হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, মৃত্যুর পরপারে আমাদের জন্য প্রশস্ততর কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত থাকিবে, এখানকার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সীমার গণ্ডী নিশ্চয় কাটিয়া যাইবে। এই ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিবার কারণেই মৃত্যুর পরে আমরা বিলুপ্ত হইয়া যাইব, আমাদের কোন প্রকার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে না, এরূপ কল্পনা করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। ভগবানের মঙ্গল বিধানে মৃত্যুই আমাদের জীবনের উৎস। প্রতি মুহূর্ত্তে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে দ্রুত অগ্রসর হইবার জন্য আমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও চেষ্টা জাগ্রত হয়। এ সংসারে বৃথা কালক্ষেপণ করাইবার সহায় অসংযত আমোদ-প্রমোদ হইতে উন্নতি ও মঙ্গলের নিদান প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে মৃত্যুই আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া আনে; হাস্য-পরিহাস ও দ্বন্দ্ব-বিবাদের বৃথা কোলাহল-কলরব হইতে নিবৃত্ত করিয়া মৃত্যু আমাদিগের অন্তরকে গাম্ভীর্য্য ও সাধুভাবে পূর্ণ করিয়া দেয়। আমরা মৃত্যুর দ্বারাই মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হই। তাই মানুষের জ্ঞানের উন্মেষ অবধি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শতবিধ আকার-প্রকারে, মানুষের কার্য্যে ও কাব্যে মৃত্যুর কথা এবং মৃত্যু-সোপানে জীবনলাভের কথা অনুদিন ফুটিয়া উঠিতে চাহে।

১৭। মৃত্যুর পরে সংশয় নাশ।

আমরা যদি কোন বিষয় বা বস্তুকে ধ্যান করি, অর্থাৎ নিবিষ্টচিত্তে অনন্যমনে তাহার বিষয় চিন্তা করি, তখন তাহার সম্বন্ধে আমরা অনেক নূতন তত্ত্ব লাভ করিতে পারি। কারণ তখন তাহাকে যথাসম্ভব তাহার নানাবিধ সীমার সঙ্কীর্ণতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক-রূপে চিন্তা করি। যখন আমরা আমাদের আত্মাকে এই দেহের সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক দেখিতে পাইব, মৃত্যুর পরবর্ত্তী সেই অবস্থায় মনে হয় আমাদের অনেক সংশয় মিটিয়া যাইবে, অনেক বিরোধ-বিবাদের অবসান হইবে, সমস্ত প্রকৃতির সহিত এবং প্রকৃতির অধিপতি পরমাত্মার সহিত আত্মার এক আশ্চর্য্য যোগ এবং অননুভূতপূর্ব্ব মিলন নবতরভাবে অনুভূত হইবে।

কি কারণে আমরা জানি না, ইহলোক হইতে পরলোকের প্রতি আমরা সামান্য উঁকিঝুঁকি মারিবার ক্ষমতা রাখি। কিন্তু সময় সময় সাধনের পথে যে সকল সাধু-মহাত্মা অগ্রসর হইয়াছেন, যাঁহাদের দৃষ্টিতে পরলোক হস্তস্থিত পুস্তকের ন্যায় উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের নিকট আমরা এই সত্যবাণী প্রাপ্ত হই এবং আমাদের অন্তরও তাহাতে সায় দেয় যে, মৃত্যুর পরে আমাদের সঙ্কীর্ণতার সীমা অনেকটা ঘুচিয়া যাইবে এবং ইচ্ছা, জ্ঞান ও প্রেম-ভক্তির দিব্য পথ বহুলরূপে প্রশস্ত ও উন্মুক্ত হইয়া যাইবে।

নিম্ন জাতিগণের প্রতি সুবিচার।

(জনৈক শিক্ষক)

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এখন আমরা সভ্যতার উচ্চ শিখরে দাঁড়াইলেও এক সময়ে আমরা বর্ব্বর জাতিগণেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম এবং অসভ্য জাতি হইতেই আমরা সমুদ্ভূত হইয়াছি। পাশ্চাত্য জাতিগণ সাধারণতঃ মনে করে, অবশ্য অহঙ্কারে, তাহারা ব্যতীত অন্য যে কোন দেশে যে কোন জাতি আছে, তাহারা সকলেই কম-বেশী অসভ্য ও তাহাদের নিজেদের তুলনায় নিম্নজাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ইংরাজেরা যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসে, তখন ভারতবাসীদিগকে অনাবৃতদেহে থাকিতে দেখিয়া এবং অনেক কাঁচা ফলমূল খাইতে দেখিয়া অসভ্য মনে করিত; এমন কি, অনেক ইংরাজ পর্য্যটক তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তেও ভারতবাসীকে "অসভ্য" অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দ্বীপের আদিমনিবাসীদিগের সহিত একপর্য্যায়ে ফেলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। ক্রমে ভারতের উচ্চতম সভ্যতা দেখিয়া ক্রমশঃ তাঁহাদের সে ধারণা চলিয়া গিয়াছে, সম্পূর্ণ চলিয়া গিয়াছে কি না বলা যায় না। পাশ্চাত্য জাতিদিগের সাধারণতঃ এই ধারণা ছিল যে, যে সকল জাতির দেহচর্ম্ম তাহাদের মত শ্বেতবর্ণ নহে, তাহারাই মোটের উপর "অসভ্য" বা আমেরিকার আদিমনিবাসীদিগের সহিত একপর্য্যায়ভুক্ত। তাই তাহারা কথায় কথায় ভারতবাসীদের প্রতি "কেলে" "কৃষ্ণ" "darkie" প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগে নাসিকাকুঞ্চিত করিতে খুবই তৎপর দেখা যায়। এমন কি, ভক্তিভাজন রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম বিলাত যান, তখন তাঁহারও পিছনে ইংরাজ বালকেরা "darkie" প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণে ক্ষেপাইতে ডাকিতে ডাকিতে চলিত—তাঁহার রাস্তায় বাহির হওয়াই মুস্কিল হইয়াছিল।*

দেশবিদেশের সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে বোধ হয় পাশ্চাত্য জাতিরা বুঝিয়াছে যে, সাদা চামড়া হইলেই যে সভ্য হইবে, এমন কোন কথা নাই; আর কাল বা তামাটে রংয়ের চামড়া হইলেই যে অসভ্য হইবে, এমন কোন কথা নাই। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর আমরা আশা করি, পাশ্চাত্যদিগের ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া এখনও আমরা এবিষয়ে সুনিশ্চিত হইতে পারি নাই।

নিষ্ঠুরতা দ্বেষ হিংসা, অন্যের সর্ব্বনাশসাধনে অগ্রসর হওয়া প্রভৃতি যদি বর্ব্বরোচিত অসভ্যতার পরিচায়ক হয়, তবে আমাদের ইহা বলিবার অধিকার আছে যে, পাশ্চাত্য জাতিরা আজ পর্য্যন্ত আদিম মানবের উপযুক্ত বর্ব্বরতা ও অসভ্যতা সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে নাই।

আমরা বর্ত্তমানে আপনাদিগকে সভ্যজাতি বলিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেও ইহা আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এক সময়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ অসভ্য অবস্থাতেই কাল যাপন করিত—অনাবৃত দেহে পশুহিংসা করিয়া এবং পশুদিগের কাঁচা মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিত। হিংস্র পশুদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহারা কখনও বা গাছের উপরে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকিত আর কখনও বা রৌদ্র-বৃষ্টির দৌরাত্ম্য এড়াইবার জন্য পর্ব্বতের গুহায় বাস করিত। তাহারা ক্রমশঃ চাষ করিতে আরম্ভ করিল এবং অগ্নি আবিষ্কার করিয়া কাঁচা মাংসের পরিবর্ত্তে মাংস প্রভৃতি অগ্নিপক্ক করিয়া খাইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহারা প্রয়োজন অনুসারে গো, অশ্ব, কুকুর প্রভৃতি পশুদিগকে স্ববশে আনিয়া পোষ মানাইতে লাগিল এবং তাহাদিগকে আপনাদিগের কার্য্যে সহায়রূপে প্রস্তুত করিয়া লইল। তাহারা পর্ব্বতগুহা এবং বৃক্ষের উপরস্থ বাসা পরিত্যাগ করিয়া গৃহাদিনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। তখন নিকটস্থ ও দূরস্থ প্রতিবেশীগণের সঙ্গে কথোপকথন চালাইবার জন্য ভাষা রচনা করিতে বাধ্য হইল। যতদূর জানা যায়, কহিবার ভাষা প্রচলিত হইবার বহু পরে লিখনপ্রণালী আবিষ্কৃত হয়। দেখা যায়, প্রথম প্রথম মানুষ মনের ভাব চিত্রের দ্বারাই ব্যক্ত করিতে অগ্রসর হইত। তাহাতে নানাবিধ গুরুতর অসুবিধা দৃষ্ট হওয়ায় ক্রমশঃ লিখিবার অক্ষরসমূহ উদ্ভাবিত হইল। বলিবার ও লিখিবার ভাষা যতই ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে

* ইউরোপপ্রবাসীর পত্র।

লাগিল, মানুষও ততই উন্নতির অভিমুখে দ্রুতপদে ছুটিয়া চলিল।

বিভিন্ন দেশের অধিবাসীগণ যে একই প্রকার ক্ষিপ্রগতিতে উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা নহে। দেশ কাল ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন জাতি সভ্যতা ও উন্নতির বিভিন্ন সোপানে আরোহণ করিয়াছে। এখনও জগতে অনুন্নত ও অসভ্য অবস্থায় অনেক জাতি আছে দেখা যায়; কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে সকলেই নিষ্ঠুর এবং বর্ব্বরাধম, তাহা বলা যায় না। ঐ সকল জাতির মধ্যে এমন কোন কোন জাতি আছে, যাহারা বর্ত্তমানের সভ্যতাভিমানী জাতিসমূহকেও তাহাদের কল্যাণপ্রদ অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে পারে। আমাদের এই ভারতবর্ষেই আমরা সাঁওতাল প্রভৃতি অনেক জাতিকে অসভ্য বলিয়া থাকি; কিন্তু আশ্চর্য্য এই, উত্তর ভারতের সাঁওতাল প্রভৃতি এবং দক্ষিণ ভারতের কুরুবর আদি তথাকথিত অসভ্য জাতিগণের মধ্যে প্রতারণা, মিথ্যাকথা প্রভৃতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বরঞ্চ দেখা যায়, সভ্যতার সংস্পর্শে এই সকল পাপ তাহাদের মধ্যে অল্পে অল্পে প্রবেশ করিতেছে। রাঁচি প্রভৃতি স্থানে একই অসভ্য জাতি, পূর্ব্বপুরুষদিগের ধারায় চালিত এবং সভ্যতার "আলোকপ্রাপ্ত" এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য দেখিলেই উপরোক্ত কথার যাথার্থ্য সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইবে।

দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি নানা স্থানের পর্য্যটকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে দেখা যায় যে, তথাকার অধিবাসাগণ দয়া প্রভৃতি নানাবিধ সদ্গুণে বিভূষিত ছিল। সভ্যজাতিগণ যাহাদিগকে অসভ্য বলিয়াছেন, তাহারাই এক সময়ে আফ্রিকাপর্য্যটক লিভিংষ্টোনের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু তাহার ফলে হইল কি? সভ্য (?) পাশ্চাত্যজাতি তাহাদিগকে শতবিধ পাশজালে আবদ্ধ করিয়া অত্যাচারপ্রপীড়িত করিয়া তুলিল। দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে স্পেনবাসীগণ প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে অত্যাচার ও রোগসংক্রমণের দ্বারা নিতান্তই জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় "বুশম্যান" বা গুল্মবাসী বলিয়া এক জাতি আছে। পাশ্চাত্যদিগের মতে এই জাতি অসভ্যতার নিম্নতম সোপানে অধিষ্ঠিত। কিন্তু পর্য্যটকেরা বলেন, তাহারাও নানা সদ্গুণে বিভূষিত। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং দলবদ্ধ হইয়া শিকারে বহির্গত হয়। যখন আহারের জন্য তাহারা কোন পশু বধ করে, তখন তাহাদের কেহ একাকীই তাহা গ্রহণ না করিয়া দলভুক্ত সকলের সঙ্গে ভাগবণ্টন করিয়া লয়। দলের যদি কেহ কোন কারণে আহত হয়, তবে সকলে মিলিয়া তাহার সেবাশুশ্রূষা করে, আহত ব্যক্তিকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য পথের ধারে ফেলিয়া চলিয়া যায় না।

একবার একটী গুল্মবাসী নদীতে ডুবিয়া যাইতেছিল। তাহার সহচরবর্গ তাহাদের চর্ম্মনির্ম্মিত পরিধেয় তৎক্ষণাৎ খুলিয়া ফেলিয়া নদীর বরফগলা শীতল জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং সেই জলমগ্ন সঙ্গীটীকে কূলে উঠাইয়া আনিয়া আগুনের সেক দিতে লাগিল এবং তৈলাদি মর্দ্দন করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিল।

গুল্মবাসী স্ত্রীলোকেরা তাহাদের সন্তানগণের প্রতি এতই স্নেহপ্রবণ যে, সন্তান বিপদের সম্মুখীন হইলে মাতা নিজের বিপদআপদ অগ্রাহ্য করিয়া তাহার উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। একবার এক ইউরোপীয় কোন গুল্মবাসী বালককে "ক্রীতদাস" করিবার অভিপ্রায়ে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছিল। তাহার জননী ধরা পড়িয়া ক্রীতদাস হইবার আশঙ্কা সত্বেও পুত্রের উদ্ধারকামনায় ইউরোপীয়ের সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গুল্মবাসীদিগের অনুরূপ হটেন্টট্ বলিয়া আর এক জাতি বাস করে। তাহারাও চর্ম্মনির্ম্মিত, গলা হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বমান একপ্রকার যে "আল্‌খাল্লা" দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত রাখে, সেই পরিধেয়খানি যতদিন না টুকরা টুকরা হইয়া ছিঁড়িয়া যায়, ততদিন তাহারা উহা পরিত্যাগ করে না।

কিন্তু তাহাদের মধ্যে এমন একটি সুন্দর প্রথা প্রচলিত আছে, যাহার জন্য তাহারা আমাদের সকলেরই নিকট প্রশংসা পাইতে পারে। যদি কোন হটেন্টট্‌কে একাকী ভোজন করিতে হয়, তবে সে বড়ই অসোয়াস্তি বোধ করে; তাহার নিকট দিয়া ভোজনের সময় যদি কেহ চলিয়া যায়, অপরিচিত হইলেও সে তাহাকে ডাকিয়া একত্র ভোজন করিতে বসে।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিমনিবাসীগণ আর একটি অসভ্য জাতি। শ্বেতাঙ্গগণ তাহাদিগকে "কালা আদমী" বলিয়া ঘৃণা প্রদর্শন করে। তাহাদের অতি অল্পসংখ্যকই অবশিষ্ট আছে। তাহারা নরভুক্ বটে, কিন্তু তাহারা নিজেদের দলের লোককে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে—দুর্ব্বল ব্যক্তিকে যত্ন করে, বৃদ্ধদিগের সেবা করে, এবং পীড়িতদিগের শুশ্রূষাবিধান করে। ডেভিড কারনেগী নামক এক ব্যক্তি স্বর্ণখনির সন্ধানে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে তিনি বলেন, সেখানে এক আদিমনিবাসীর কুটীরে গিয়া তিনি দেখেন যে, এক

বেচারী শিশু একটী বৃদ্ধকে জাপটাইয়া ধরিয়া আছে। শিশুটীর চক্ষের পাতায় ক্ষত হইয়াছিল এবং তাহাতে মাছি বসিতেছিল। কারনেগী তাঁহার সঙ্গে যে ঔষধপত্র লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে একটা ঔষধ বাহির করিয়া শিশুর চক্ষু ধুইয়া দিলেন। ফলে চক্ষুটী ভাল হইয়া গেল। বৃদ্ধ ইহাতে যে কি পর্য্যন্ত সন্তোষ পাইয়াছিল, তাহা নানা ভাবভঙ্গীসহকারে প্রকাশ করিতে লাগিল। কারনেগী তাঁহার পর্যটনের শেষে আবার যখন এই কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন বৃদ্ধটী একটী "মোট" সহ অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিল এবং তাঁহাকে ঐ মোটটী উপহার দিল। ঐ মোটটির ভিতরে একখানি বৃহৎ কাষ্ঠ ছিল—তাহার দুই পৃষ্ঠেই মোটারকমের ছবি খোদাই করা। আদিমনিবাসীগণ ভাবিল যে, ইহা কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের জন্য উপহার দিবার উপযুক্ত একটী মূল্যবান বস্তু। কারনেগী উহা সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইলেন। তাহারা অসভ্য হইলেও কারনেগী-কৃত উপকার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল।

আমেরিকার উত্তরভাগে সুমেরু-কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে এস্কিমো বলিয়া এক অসভ্য জাতি দেখা যায়। তাহাদের কেহ যদি অনেক টাকাকড়ি পায়, তবে সে তাহা দ্বারা এক-রাশ জিনিসপত্র কিনিয়া নিজেই ভোগ করিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু সকলের সহিত মিলিয়া জুলিয়া ভোগ করিতে চায়। সে একটি সভা আহ্বান করে এবং বড় রকমের একটি ভোজ দেয়। সেই ভোজ উপলক্ষে সমাগত বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সে তাহার ধনরত্ন ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া দেয়। উত্তর আমেরিকার উকেরা নদীর তীরে এক ধনী এস্কিমো পরিবার বাস করিত। ঐ পরিবারের কর্ত্তা এই প্রকারে এক ভোজ দিবার পর, এক শতচ্ছিদ্র চর্ম্মবস্ত্র পরিধান করিয়া তাহার দশটী বন্দুক, দশটী চর্ম্মবস্ত্র, দুইশত ফটিকমালা, অনেকগুলি কম্বল, দশটী নেকড়ে বাঘের চামড়া, দুইশত বীবরচর্ম্ম, পাঁচ শত "সেব্‌ল্‌"-চর্ম্ম, এই সকল বস্তু দান করিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এস্কিমোদের পক্ষে উপরোক্ত বস্তুগুলি বহুমূল্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কর্ত্তাটি এই সকল বিতরণ করিবার সময় উপস্থিত তাহার বন্ধুবর্গকে বলিল যে, "এখন আমি তোমাদের সকলের চেয়ে গরিব হইলাম ; কিন্তু তোমাদের যে বন্ধুতা ও ভালবাসা লাভ হইল, ইহাতেই আমি খুসী"।

এস্কিমো প্রচুর পরিমাণে আহার করিতে পারে ; এমন কি, কখন কখন একদিনে বারো সের মাংস খাইয়া শেষ করে। শীতের কারণে এইরূপ প্রচুর আহার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তথাপি দেখা গিয়াছে যে, এস্কিমো পিতা তাহার সন্তানের জন্য খাদ্য সঞ্চিত রাখিবার উদ্দেশে একাধিক দিন বিনা আহারে দিনপাত করিয়াছে।

এসিয়া মহাদ্বীপের উত্তরে রাশিয়ার উত্তরভাগে "লেখা" নদীর তীরে "বুরিয়াট্" নামে এক জাতি বাস করে। ইহাদের কেহ যদি তাহার সমস্ত ধন খোয়াইয়া বসে, তবে সে আহারের জন্য এক প্রতিবেশীর গৃহে উপস্থিত হয় এবং সেখানে অগ্নিপার্শ্বে প্রতিবেশীর সঙ্গে একত্র ভোজনে বসিয়া যায়, অনাহূত অতিথি হইলেও তাহাকে কেহ বাধাপ্রদান করে না। এই জাতি বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত—বাপ, ছেলে, নাতি প্রভৃতি লইয়াই এক-একটি পরিবার গঠিত হয়। এক-একটি পরিবারের অধীনে যে সমস্ত ক্ষেত থাকে, সেগুলি পরিবারস্থ সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া ধরা হয়। যদি কোন পরিবারের পশ্বাদি ঝড়ে, রোগে বা অন্য কারণে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে অন্যান্য ধনী পরিবার সেই পরিবারকে গরু, ঘোড়া প্রভৃতি দিয়া নূতন করিয়া সংসার গুছাইয়া লইবার অবসর প্রদান করে। কতকগুলি পরিবার লইয়া এক-একটী দল গঠিত হয়। প্রতি বৎসর একবার করিয়া এই দলের একটী সভা আহূত হয় ; সেই সভায় আসিবার সময় প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক মাসের উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়। সমস্ত খাদ্য সাধারণ পাকশালায় রন্ধন করা হয়। এক মাস ধরিয়া সমাগত লোকেরা শিকারে নিযুক্ত থাকে। শিকারে যে যাহা কিছু পায়, সে সমস্তই দলস্থ পরিবারবর্গের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

এইরূপে দেখা যায় যে আমরা যাহাদিগকে অসভ্য জাতি বলি, তাহাদেরও মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যাহারা আপনাদিগকে সভ্য জাতি বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করে, সেই সকল তথাকথিত সভ্য জাতিদিগের সংস্পর্শে আসিয়া কোথায় তাহারা আরও অনেক সদ্‌গুণ অর্জ্জন করিবে, না, তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা নিজেদের সদ্‌গুণ তো হারাইয়া বসেই, অধিকন্তু সভ্য (?) জাতিদিগের নানা অসদ্‌গুণ আয়ত্ত করে।

আমি রাঁচিতে গিয়া ইহার যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাঁচি প্রভৃতি অঞ্চলে একই অসভ্যজাতি, পূর্ব্বপুরুষদিগের ধারায় চালিত এবং সভ্যতার "আলোকপ্রাপ্ত" মোটামুটি এই দুইভাগে বিভক্ত দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্যজাতির যে সকল পরিবার স্ব-ধর্ম্ম বা পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত

আচার-ব্যবহার রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহারা এমনও
সত্যপরায়ণ, অব্যভিচারী, পরস্পরের সাহায্যকারী
রহিয়াছে। যে সকল পরিবার সভ্যজাতিদিগের প্রচা-
রিত খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাহাদিগের আচার-ব্যব-
হারের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মিথ্যা-
পরায়ণতা ব্যভিচার এবং সকল দোষের প্রধান মূল সুরা-
পান যথেষ্ট প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আমার প্রশ্নের
উত্তরে খৃষ্টীয় মিশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ স্বীকার করিতে বাধ্য
হইয়াছিলেন যে, খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বনের ফলে তাহাদিগের
অবনতিই ঘটিয়াছে। ইতিহাসে পড়া যায়, স্পেনবাসী
প্রভৃতি সভ্যজাতিদিগের সংস্পর্শেই ভয়াবহ সংক্রামক
রোগসমূহ অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে প্রবেশলাভ
করিয়াছে। তৎপূর্ব্বে সে সকল রোগ তাহাদের মধ্যে
অজ্ঞাত ছিল। সভ্যজাতিরাই সভ্যতার দোহাই দিয়া
চারিদিকেই অসভ্য জাতিদিগের ধন-রত্ন ও ভূমি, গো,
অশ্ব প্রভৃতি অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে চৌর্য্যবৃত্তি
অনেকাংশে শিখাইয়াছে, ইহা জানা কথা। আবার, অপ-
হরণের প্রতিবাদ করিবার ফলে সভ্যজাতির গোলা-গুলির
মুখে শত শত অসভ্য ও তথাকথিত অসভ্য (?) প্রাচীন জাতি-
সমূহের বিনাশ ও বিলোপ সাধিত হইয়াছে, ইহাও
ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। পাশ্চাত্যগণ কৃত-
দাসপ্রথা অনেক পরিমাণে উঠাইয়া দিয়াছেন সত্য; কিন্তু
এখনও বিভিন্ন স্থানে অধীনস্থ প্রজাদিগের উপর তাহা-
দিগের যে ভীষণ অত্যাচারকাহিনী শোনা যায়, তাহা
কৃতদাসপ্রথার অত্যাচার হইতে কোন অংশেই ন্যূন
নহে। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের অব্যবহিত পূর্ব্বেই
সংবাদ পত্রে পড়িয়াছিলাম যে, আফ্রিকার অন্তর্গত
কঙ্গোরাজ্যে তথাকার প্রভু বেলজীয়গণ তাহাদের
আদেশ অমান্য করিবার কারণে স্থানীয় মজুর প্রভৃতির
নাক-কাটা, হাতের আঙ্গুল-কাটা, পা-কাটা প্রভৃতির
ভীষণ দণ্ড প্রদান করিয়াছে। এই অমানুষিক পীড়ন-
কাহিনী পড়িয়া সভ্যতাভিমানী বেলজীয়দিগকে সভ্য তো
দূরে থাক, মানুষ বলিয়া মনে হয় না—নরাধম পশু বলিতে
ইচ্ছা হয়।

সভ্যতার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, মনুষ্যমাত্রেরই,
সভ্য হউক বা অসভ্য হউক, অন্তরে মনুষ্যত্ব জাগাইয়া
তোলা। অত্যাচার ও পীড়নের দ্বারা সে উদ্দেশ্য
কিছুতেই সাধিত হইতে পারে না। সে উদ্দেশ্যসাধনের
প্রধান উপায় দয়া, মৈত্রী, সত্যপরায়ণতা, অব্যভিচার
প্রভৃতি সদ্‌গুণ ও সাধুভাবের সাধন। আমরা দেখি, সুরা
প্রভৃতি মাদক-দ্রব্য ব্যবহারের ফলে ব্যভিচার, প্রবঞ্চনা,
এমন কি নরহত্যা পর্য্যন্ত সংঘটিত হয়। ইহা
দেখিয়াও অনেক পাশ্চাত্যজাতি মাদকদ্রব্য ব্যবহারকে
আয়ের উপায়স্বরূপে গণ্য করিয়া তাহাদের অধীনস্থ
দেশে ও জাতিসমূহের মধ্যে উহা বলপূর্ব্বক প্রবেশ
করাইতে দ্বিধা করে নাই। তাহারা ভুলিয়া যায় যে,
ইহা দ্বারা কেবল শাসিত জাতিসমূহের নহে, কিন্তু
ইহার প্রতিক্রিয়ার ফলে শাসকদিগেরও ধ্বংসের মূল
প্রোথিত করা হয়। এই যে বৌদ্ধধর্ম্ম সময়ে এসিয়ার
এক প্রান্ত হইতে আমেরিকার অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃতি
লাভ করিয়াছিল এবং এখনও ইহার প্রভাব সভ্যজগতে
সর্ব্বত্র সবল আকারে অনুভূত হইতেছে, ইহার কারণ,
ধর্ম্মের অঙ্গরূপে বৌদ্ধদিগের দয়া, মৈত্রী প্রভৃতির সাধন
এবং দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতির বর্জ্জন। পাশ্চাত্য সভ্যতা-
ভিমানী জাতিগণ যদি অন্যান্য জাতিসমূহের অন্তরে
তাঁহাদের সভ্যতা প্রবিষ্ট করাইয়া সত্যই স্থায়ী কীর্ত্তি
রাখিতে চান, তবে মার্কিনদিগের অযথা নিগ্রো-
বধের ন্যায় অথবা বেলজীয় কর্ত্তৃক কঙ্গোবাসীদিগের
অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতির ন্যায় নিষ্ঠুর রীতিসকল তাঁহাদের সম্যক-
প্রকারে বর্জ্জন করিতে হইবে; আবগারীবিভাগের আয়-
বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সর্ব্ববিধ মাদক দ্রব্য-
ব্যবহারনিবারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এক কথায়,
ভগবানের আদর্শকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া অপরের প্রতি
অন্যায় ব্যবহার না করিয়া অধীনস্থ প্রজাবর্গের সুখ-
সমৃদ্ধি ও শান্তিবর্দ্ধনে সহায়তা করিতে হইবে। সমগ্র
জগতের যাহাতে উন্নতি ও মঙ্গল সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারই
বিধানে দৃঢ়প্রযত্নে সচেষ্ট হইতে হইবে।

মানবজীবনে বিধাতার লীলা।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

ভক্তি যে অন্ধ এ কথাটা বুঝি নিতান্ত মিথ্যা নয়।
জ্ঞানবুদ্ধি মানুষকে পথ দেখিয়া চলিতে পরামর্শ দেয়;
ভক্তি দেখিতে চায় না, মানুষকে নির্ভয়ে অন্ধকারপথে
অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করে। মানুষ জ্ঞানবুদ্ধির
সাহায্যে প্রকৃতিকে জয় করিয়া কত না আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য
ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছে। ভক্তি ভগবানকে বলে, "হে
প্রভু, তোমারই হাতে আমার জীবনের ভার সমর্পণ
করিলাম, তোমার যেখানে ইচ্ছা আমাকে সেইখানে
লইয়া যাও।" যদি আমরা আমাদের ইচ্ছামত জীবনকে
পরিচালিত করিতে পারিতাম, স্বাস্থ্য ও রোগ যদি
আমাদের আদেশের অনুবর্ত্তী হইত, মৃত্যু যদি আমাদের
আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করিত, ধনমান-উপার্জ্জন যদি
আমাদের হাতে হইত, মানবের অতীত ইতিহাস আমা-

দের চক্ষে যেমন পরিষ্কার, মানবের ভবিষ্যৎ ইতিহাস যদি সেইরূপ স্বচ্ছ হইত এবং তাহা যদি আমরা আমাদের ইচ্ছানুসারে নিয়মিত করিতে পারিতাম—তবে জ্ঞান-বুদ্ধির দৃষ্টিতে সমাজের উন্নতির যাহা চরম অবস্থা সেই অবস্থায় আমরা উপনীত হইতাম। কিন্তু পৃথিবীর এরূপ উন্নত যুগে কোথাও কোন দেবমন্দির থাকিত না, তাহার সাহিত্যে কবিতা থকিত না, তাহার ভাষায় অনুতাপ ও প্রার্থনার শব্দ থাকিত না, তাহার সঙ্গীতে বন্দনা ও সঙ্কীর্ত্তন থাকিত না, তাহার সন্ধ্যাকালে আরতির দীপ জ্বলিত না, আর সেই উন্নত যুগের মানুষ অন্তরের নিভৃতে ভগবানের নিঃশব্দ বাণী শুনিবার জন্য শান্ত ও সমাহিতচিত্তে অপেক্ষা করিত না।

যেমন দিবাভাগেও আকাশে নক্ষত্রমালা থাকে বটে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই না, আমরা কেবল পৃথিবীর সামগ্রী সকলই দেখিতে পাই; সেইরূপ সেই জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত যুগেও অবশ্য ভগবান :থাকিতেন কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম না, আমরা কেবল সংসারই দেখিতাম, উর্দ্ধলোক আমাদের অন্তশ্চক্ষুর অতীত হইত।

আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি আমাদিগকে বলে যে, যাহা চক্ষুকর্ণের অগোচর তাহার চিন্তা ও আলোচনা বৃথা। মৃত্যুর পরে কি হইবে তাহা যখন জানিবার উপায় নাই, তখন সেকথা ভাবিয়া কি হইবে? আমরা যে সংসারে আছি সেই সংসারে লোকের অনেক দুঃখকষ্ট আছে, যতদুর পার এই দুঃখকষ্ট মোচন করিবার চেষ্টা কর; যাহাতে দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হয়, লোকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, অন্যায় ও অত্যাচারের দমন হয়—সেই সকল বিষয়ে মনোযোগ দেও তাহা হইলে সংসারকে খানিকটা উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে পারিবে। কিন্তু যদি পরলোকের পানে চাহিয়া ইহলোকের কর্ত্তব্য অবহেলা কর তবে কি জ্ঞানের অপেক্ষা অজ্ঞানতাকে বড় করা হইবে না এবং সত্যকে তুচ্ছ করিয়া কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে না? আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিবলে যে, ধর্ম্মের সহিত সংসারের কোন সম্বন্ধ নাই এবং ধর্ম্ম মানিলে সংসারের কর্ত্তব্যপালনে ক্রটী হয়। অনেক লোক জ্ঞানবুদ্ধির এইরূপ প্রতিবাদ শুনিয়া ধর্ম্মকে জীবন হইতে বিদায় করিয়া দেন।

পরলোকের পানে চাহিয়া ইহলোকের কর্ত্তব্য অবহেলা করা যে মস্ত ভুল, তাহাতে সন্দেহ কি? যিনি জীবনে তাঁহার কর্ত্তব্য উপযুক্তরূপে পালন করিতে চান, তাঁহাকে সংসারের দিকে চাহিয়াই সে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে। তাঁহাকে দেখিতে হইবে কাহার কি অভাব আছে, তাঁহার কি করিবার সুযোগ আছে এবং কি করিবারই বা তাঁহার নিজের সামর্থ্য আছে। যে কাজ তিনি ভাল করিয়া করিতে পারেন, তাহাই তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া মনে করা উচিত। অপরের কোন উপকার করিতে হইলে যদি তাঁহাকে নিজের কোন আরাম ও সুবিধা বিসর্জ্জন করিতে হয়, তবে এই ত্যাগই তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সংসারকেই আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া ভগবান আমাদের এই বর্ত্তমান জীবন দান করিয়াছেন, কিন্তু যিনি সংসারের কাজকর্ম্মকে ধর্ম্মের বিরোধী মনে করিবেন, নিশ্চয়ই বলিব যে, তাঁহার ধর্ম্ম ধর্ম্ম নয়—কিন্তু কল্পনা, এবং তাঁহার উপদেশ শুনিলে কর্ত্তব্য অবহেলা অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। সংসারের কাজকর্ম্ম ভগবানের বিধান, আমরা ধর্ম্মের নামে কখনই ইহা তুচ্ছ করিতে পারি না।

কিন্তু ধর্ম্মের নামে যেমন আমরা সংসারকে তুচ্ছ করিব না, তেমনি সংসারের দোহাই দিয়াও আমরা ধর্ম্মকে, জলাঞ্জলি দিব না। এ কথা কি সত্য যে ধর্ম্মের সহিত সংসারের বিরোধ আছে? এ কথা কি সত্য যে ভগবানে ও পরলোকে বিশ্বাস করিলে আর সংসারের কাজকর্ম্ম করা চলে না? সত্য কথা এই যে ধর্ম্মবিশ্বাস সাংসারিক উন্নতির অন্তরায় নয় বরং সহায়, এবং যাঁহারা ঈশ্বর ও পরলোকে দৃঢ়বিশ্বাসী, তাঁহারাই জগতের উন্নতির জন্য মনপ্রাণ উৎসর্গ করেন। যদি পরলোক না থাকে, চিতার আগুনেই যদি মানুষের পরিসমাপ্তি সত্য হয়, তবে মানবজীবন কত তুচ্ছ হইয়া যায়। আর যদি বিশ্বাস করি যে, অনন্ত জীবনে প্রত্যেক মানবাত্মা ক্রমাগত উন্নতি হইতে উন্নতিতে আরোহণ করিবে, তবে মানবজীবন কত গৌরব ও গভীরতা লাভ করে, এবং সেই অমরাত্মার বর্ত্তমান আশ্রয় এই যে রক্তমাংসের দেহ তাহাকেও আমরা সম্মান না করিয়া থাকিতে পারি না।

যদি আমরা পরলোক না মানি এবং ইহকালকেই সর্ব্বস্ব করি, তাহাতে যেমন মানবজীবন তুচ্ছ হইয়া যায়; সেইরূপ যদি আমরা ভগবানকে না মানি এবং মানুষকেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া কল্পনা করি, তাহাতেও মানুষকে আমরা অতিশয় তুচ্ছ করিয়া ফেলি। ঈশ্বরের পূজা ও বন্দনা করিবার অধিকার মানুষের আছে এবং তাঁহার সহিত যোগস্থাপন মানুষের পক্ষে সম্ভব বলিয়াই কাহারও নীচ বৃত্তি দেখিলে আমাদের দুঃখ হয়, কাহারও অসংযত চরিত্র দেখিলে আমাদের লজ্জা হয়, এবং কাহাকেও চিন্তাহীন ভাবে কেবল আমোদপ্রমোদে ও

বিলাসসম্ভোগে দিন কাটাইতে দেখিলে আমাদের বিরক্তি লাগে।

যতই আমরা ধর্ম্মকে হৃদয় হইতে বিদায় করিয়া দিই এবং কেবল সংসারের দিকে চাহিয়া বর্ত্তমান জীবনকে বড় করি, ততই আমাদের এই বর্ত্তমান জীবন ছোট হইয়া যায়—এ কথাটা সহসা শুনিতে বড় অদ্ভূত লাগে বটে, কিন্তু কথাটা সত্য। আমরা কি লোকের সহিত প্রতারণা করিব না এইজন্য যে, তাহাতে আমাদের কারবারের উন্নতি হইবে? আমরা কি শুদ্ধ ও সংযত চরিত্র হইবার চেষ্টা করিব এই জন্য যে, তাহাতে আমরা সবল সুস্থদেহ ও দীর্ঘজীবী হইতে পারিব? আমরা কি লোকের প্রতি অন্যায় আচরণ হইতে বিরত থাকিব এইজন্য যে, অন্যায় আচরণ করিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে এবং তাহাতে আমাদের নিজেরও অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা? আমরা কি দুঃখীকে দয়া করিব এইজন্য যে, সে তাহার দুঃখের কাহিনী বলিয়া এবং সাহায্যের প্রার্থনা করিয়া আমাদের জ্বালাতন করিবে না? যদি এই সকল কথা সত্য হইত তবে কি মানুষ সাধুতার এত আদর করিত, না নির্ম্মল জীবনের জন্য মানুষ এত আকুল হইত, না দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার দেখিয়া এমন আত্মহারা ঘৃণা আসিত, না পরের দুঃখে মানুষের প্রাণ এমন করিয়া বিগলিত হইত? মানুষ শুধু পৃথিবীর জীব নয় কিন্তু তাহার প্রকৃতির মধ্যে স্বর্গের উপাদানও নিহিত আছে। এক-এক জন ভাল লোকের অন্তরে যে স্নেহপ্রেম, যে সাধুতা, যে পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, তাহার সহিত তাঁহাদের সাংসারিক সুবিধার কোন সম্বন্ধই নাই। কখন কখন একজন বিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এমন সকল লোকের মধ্যে পড়েন, যাহারা স্বার্থ ও সাংসারিক সুবিধা ভিন্ন আর কিছুই বোঝে না। এরূপ অবস্থায় যদি তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে ধর্ম্ম হইতে সাংসারিক জীবনেও সুবিধা হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ কি তিনি নিজেই অনুভব করেন না যে তাঁহার কথায় ধর্ম্মের গৌরব ম্লান হইয়া গেল? আর যাহারা সংসারসর্ব্বস্ব ও বিশ্বাসবিহীন তাহাদিগকে সাংসারিক সুবিধার লোভ দেখাইয়া যদি তিনি ধর্ম্মবিশ্বাস দান করিবার চেষ্টা করেন, তবে দেখিবেন যে সেরূপ উপদেশে কোন ফল হয় না। স্বার্থের দোহাই দিয়া কখনও বিবেককে জাগ্রত করা যায় না। সাংসারিক সুবিধার লোভ দেখাইয়া কখনও মানুষকে ধার্ম্মিক করা যায় না।

সংসারের উন্নতি ধর্ম্মের লক্ষ্য নয় একথা সত্য, কিন্তু ইহাও বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে সংসারে যত প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সে সকলেরই পশ্চাতে বিশ্বাসী ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের উৎসাহ উদ্যম প্রযত্ন ও স্বার্থত্যাগ বিদ্যমান। জ্ঞানবুদ্ধির উপদেশ এই বটে যে সংসারের উন্নতি করিতে হইলে সংসারই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, এবং ধর্ম্মকে হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু এরূপ করিলে সমাজ পাপ ও অনাচারে পচিয়া গলিয়া পূতিগন্ধময় হইয়া উঠিত। যাহারা সংসারকেই সর্ব্বস্ব করে তাহারা যে অনেক সময়ে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করে একথা সত্য, কিন্তু তাহারা সাধারণতঃ অত্যন্ত স্বার্থপর হয় ও তাহাদের দ্বারা সমাজের বড় কিছু উপকার হয় না। বস্তুতঃ যাঁহারা পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাসী ও ভগবানের চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন, ভগবান তাঁহাদেরই দ্বারা সংসারের কল্যাণ সাধন করেন। স্বর্গের আলোক দেখিতে হইলে জ্ঞানবুদ্ধির পরামর্শকে তুচ্ছ করিয়া হৃদয়ের অনুসরণ করিতে হইবে, সংসারকে ভুলিতে হইবে—এই তাঁহার বিধান।

একাকী নীরবে লোকচক্ষুর অগোচরে ভগবচ্চরণে মাথা রাখিলে মানুষ যেমন নির্ম্মল ও পবিত্র হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু এইরূপ একাকিত্ব কি মানুষকে অপর সকল লোক হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করে? এইরূপ একাকিত্ব হইতে কি স্বার্থপরতা জন্মে এবং সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া যায়? একথা কখনই সত্য নহে। এইরূপ একাকিত্ব হইতে একটা সবল চরিত্রের উদ্ভব হয়; তাহা সমাজকে যেমন দৃঢ়তা দান করে, প্রত্যেক মানুষকে স্বার্থত্যাগের জন্য যেমন অনুপ্রাণিত করে, এমন আর কিছুতেই করে না। যে মানবপ্রেমের মূলে ভগবদ্‌ভক্তি সে প্রেম যেরূপ গভীর—কি সামাজিক বা রাজনৈতিক অন্দোলন, কি দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কি ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি—এই সকলের জন্য দল বাঁধিয়া বা সভাসমিতিস্থাপন করিয়া সভ্যদিগের পরস্পরের মধ্যে সেরূপ প্রেম, সেরূপ ভ্রাতৃত্ব কিছুতেই স্থাপন করা যায় না। ভগবান জগতে যে সকল মহাব্যাপার সম্পন্ন করেন তাহাদের সম্বন্ধে একটী বড় বিস্ময়ের কথা আছে, তাহা এই যে তিনি যে সকল লোক ধরিয়া এই সকল ব্যাপার সম্পন্ন করেন তাহাদের লক্ষ্য থাকে বিপরীত দিকে। যাঁহারা পরলোকের উপরে হৃদয় স্থাপন করেন তাঁহাদিগকে দিয়াই তিনি সংসারের মঙ্গল সাধন করেন; যাঁহারা নির্জ্জনে সঙ্গোপনে তাঁহার সহিত যোগ স্থাপন করেন, তাঁহাদিগকে ধরিয়াই তিনি সমাজদেহকে দৃঢ় করেন; যাঁহারা তাঁহার চরণে মনপ্রাণ উৎসর্গ করেন, সেই রিক্তহস্ত অকিঞ্চন ব্যক্তিগণকে তিনি অপূর্ব্ব শক্তি দান

করেন ও জনসাধারণ তাঁহাদিগকেই আপনাদের নেতৃত্ব-পদে বরণ করে।

সময়ে সময়ে এক-একটা জাতির ইতিহাসে এক-একটা সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়। হয়ত একটা পরাধীন জাতি স্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে; হয়ত রাজা ও রাজকর্ম্মচারিদের অত্যাচারে প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়া উঠে; হয়ত গরীব লোকেরা বড় মানুষদের বিলাসিতা ও অর্থের অপব্যয়ের সহিত নিজেদের দুর্দ্দশার তুলনা করিয়া ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে এবং সমাজে বিপ্লব উপস্থিত করে; হয়ত বা প্রাচীন ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইয়া লোকে নূতন আলোকের অন্বেষণ করিতে থাকে। এইরূপ সঙ্কটকালে দেখা যায় যে দেশের ও সমাজের অগ্রণী ব্যক্তিগণ বুদ্ধিবিবেচনা খাটাইয়া ও যুক্তিপরামর্শ আঁটিয়া অধিকাংশের অভিপ্রায় অনুসারে একটা পথ স্থির করিয়া সেই পথে চলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এইরূপ সময়ে সহসা এক-একজন মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয়, যাঁহারা স্বর্গ হইতে অনুপ্রাণনা লাভ করেন এবং তাঁহাদের অগ্নিময় উৎসাহ সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে অগ্নিময় করিয়া তুলে। তখন সমগ্র দেশ একটা উন্নত স্তরে আরোহণ করে। জাতীয় জীবনের এইরূপ সুগম্ভীর সন্ধিক্ষণে ভগবানের অঙ্গুলিস্পর্শে মানবের হৃদয় হইতে এক অপূর্ব্ব ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে এবং মানবের কণ্ঠ হইতে এক নূতন সঙ্গীত উত্থিত হইতে থাকে। তখন নূতন ছন্দে ইতিহাস রচিত হইতে আরম্ভ হয়। লোকে যাইতে চায় এক পথে কিন্তু বিধাতা তাহাদিগকে অন্য পথে পরিচালিত করেন।

ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক সময়ে ভগবান মানুষকে অজ্ঞাত পথ দিয়া লইয়া যান। কাহার অন্তরে তাঁহার আহ্বান কখন্ আসিবে তাহার স্থিরতা নাই, এবং তোমার অন্তরে এ জীবনে সে আহ্বান আসিবে কিনা তাহাও নিশ্চয় বলা যায় না; কিন্তু ঐ আহ্বানের জন্য হৃদয়কে উন্মুক্ত রাখ এবং উহা আসিলে উহাকে প্রত্যাখ্যান করিও না। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে তাহা নির্ভয়ে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হও। যাহা অসত্য এবং কুসংস্কার বলিয়া বুঝিবে, প্রাচীন ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইলেও তাহাকে বর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইও না। যে প্রথাকে অন্যায় বলিয়া বুঝিবে, যাহাতে মনুষ্যত্বের অবমাননা দেখিবে, তাহা প্রাচীন সমাজের ভিত্তি হইলেও শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে তাহার সমর্থন করিও না, কিন্তু তাহার উচ্ছেদের জন্য বদ্ধপরিকর হও। ভগবানের বাণী যখন অন্তরে আসিবে তখন দক্ষিণে ও বামে চাহিও না, কে এ পথে তোমার সঙ্গী হইল, কে-ই বা হইল না, তাহা গ্রাহ্য করিও না, প্রভু পরমেশ্বরের আহ্বান জানিয়া এই পথে অগ্রসর হও। এতদিন যে পথে চলিতেছিলে বা জীবনে যে পথে চলিবে বলিয়া এবং যে বৃত্তি অবলম্বন করিবে বলিয়া হয়ত দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রস্তুত হইয়াছ, ভগবানের বাণী হয়ত তোমাকে সে পথ পরিত্যাগ করিতে বলিবে; যে সাধ ও যে আশা বহুদিন ধরিয়া অন্তরে পোষণ করিয়াছ, হয়ত সে আশা ও সে সাধে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, কিন্তু তুমি স্বর্গের অভিমুখে অগ্রসর হইবে। যে পথে পদার্পণ করিতেছ হয়ত সে পথ আপাততঃ অন্ধকার বলিয়া মনে হইতেছে, হয়ত বুঝিতে পারিতেছ না সে পথ কত দীর্ঘ এবং সে পথ কোন্ দিকে গিয়াছে, কিন্তু ফিরিও না। প্রভু পরমেশ্বর অচিরে তোমার অন্ধকার পথ স্বর্গের আলোকে উজ্জ্বল করিবেন।

উৎসবানন্দ-রামমোহন-রায়-সংবাদের বঙ্গানুবাদ।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী)

(২)

(রাজা রামমোহন রায়ের উত্তরে মহামহোপাধ্যায় উৎসবানন্দ)

বহ্নি প্রভৃতি ভূতের গুণ ও রূপ-বিবর্জ্জিত ঐ (পুরুষ) নিখিল দিক্ কাল ও আকাশ যিনি দেখিতেছেন, বিজ্ঞ শুক ও সনাতন কর্তৃক যিনি সর্ব্বদা স্তুত হন, তাঁহাকে আশ্রয় করিলে এখানে কাহারও নিকট হইতে ভীত হইবার কারণ নাই।

বিষ্ণুর ন্যায় উপাধিতঃ বা স্বরূপতঃ অন্য কেহ আছেন, ইহা যে সকল বিদ্বান্ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের বাক্য দ্বারা যাঁহাদের দুঃখ ও হর্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে কোন ব্যক্তি কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছেন। সচ্চিৎসুখানন্তবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণে দেহ ইন্দ্রিয় ও প্রাণ যাঁহারা সমর্পণ করিয়াছেন, (এরূপ) কোন বৈষ্ণব কোন কালেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিগুর্ণত্ব প্রতিপাদন করেন না, বরং সকল সদ্‌গুণরত্নের রত্নাকররূপেই তাঁহাকে বর্ণনা করেন। ইহার প্রমাণও কোন কোন সুকৃতিশালী ব্যক্তিরই কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। যে সকল বৈষ্ণব ক্ষীর-সমুদ্রশায়ী ভগবানের উপাসক, তাঁহারাও গুণাবতার বলিয়াই প্রখ্যাতগুণ বিষ্ণুর নিগুর্ণত্ব প্রতিপাদন করেন না। সত্ত্বগুণোপাধির বৈশিষ্ট্য সকল স্থলে অদূষণীয়; অতএব বৈকুণ্ঠনাথের উপাসকগণ এবং ইলাবৃত প্রভৃতি নয়টি বর্ষে ভবানীনাথ প্রভৃতির চরণসেবী সংকর্ষণাদি

উপাসকগণ সৃষ্টি প্রভৃতির নিমিত্ত দেহধারী ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব তিনেরই গুণাবতারত্ব হেতুই ঐকাত্ম্য—কথন স্বরূপতঃ ভেদ নাই (ইহা স্বীকার করেন) ; আরও, "যে চণ্ডাল শিব এই বাক্য বলে, তাহার সহিত বাস করিবে, তাহার সহিত কথা কহিবে, তাহার সহিত ভোজন করিবে"। "অহো, (সেই) চণ্ডাল ইহা (পণ্ডিতাদি) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম আছে ; যাঁহারা তোমার নামকীর্ত্তন করেন, সেই আর্য্যগণই ত তপস্যা করিয়াছেন, হোম করিয়াছেন, স্নান করিয়াছেন, বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি দ্বারা স্কন্দ ও পদ্ম-পুরাণে নাম-মহিমায় শিব ও বিষ্ণুর নাম-সকলেরও পরম পাবনত্ব কথন হেতু "(উহা) অর্থবাদ মাত্র, এরূপ যাহারা মনে করে, তাহারা নারকী", এই স্মৃতি হেতু নাম ও নামীর অভেদনির্ণয় ও অপ্রাকৃত প্রতিপাদন দ্বারা, তাঁহাদের (বিষ্ণু ও শিবের) কেবল নামসমূহ দ্বারা সকলের সর্ব্বাভিষ্ট-প্রাপ্তি হইবে এরূপ যাঁহারা জানিতেছেন, তাঁহারাই বিষ্ণু ও শিবের (নাম হইতে) পৃথক্ ঈশ্বরদ্রষ্টা মূঢ়দিগকে নামাপরাধী নারকী বলেন। তাই (বলা হইয়াছে), যে (ব্যক্তি) শিব ও বিষ্ণুর গুণ ও নামাদিসকল বুদ্ধি দ্বারা অভিন্ন দেখিবে, সে হরিনাম দ্বারা (নিজের) সম্যক্ হিতসাধন করে ইত্যাদি। (কারণ) "সর্ব্বাপরাধকারীও হরিকে আশ্রয় করিলে মুক্ত হয়। হরিরও প্রতি যে মানব অপরাধ করে, কথনও নামের আশ্রয় সম্ভব হইলে সে নাম দ্বারা উত্তীর্ণই হয়। কিন্তু সকলের সুহৃৎতুল্য নামের প্রতি অপরাধ হেতু (লোকে) অধঃপতিত হয়। ইত্যাদি ; অতএব তাহাদের (নাম ও নামীর) ভেদ চিন্তা করিলে কাহারও শ্রেয় হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ক বহু শ্রুতিস্মৃতি বিদ্যমান আছে, তাহা পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তিগণ শুনিয়াই থাকিবেন। অতএব হরিহর-উপাসকের সহিত কেহ বিবাদ করেন না, তাঁহাদের মতসকল সাধু ব্যক্তিদিগের মনস্তৃপ্তিকর।

অনন্তর তিনের (ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের) ঐকাত্ম্য হইলেও কোন কোন ভাগবতঅভিজ্ঞ বিষ্ণুর উপাসক সত্ত্বগুণাত্মক বাসুদেব হইতে মানবের শ্রেয়োলাভ হয়, (ইহা বলেন)। ভগবান স্বামীপাদ ভাবার্থদীপিকা দেখিয়া ঐরূপ প্রতিপাদন করেন ; যথা—গুণত্রয়ের মধ্যে তমোগুণ ভূতের উপাদান হেতু আধিভৌতিক, রজোগুণ ইন্দ্রিয়সমূহের কারণ বলিয়া আধ্যাত্মিক, সত্ত্বগুণ দেব-সৃষ্টির কারণ বলিয়া আধিদৈবিক নিয়ামক ; সেই (সত্ত্ব-গুণের) উপাধিবিশিষ্ট বিষ্ণুই ঈশ্বর। তাহা (সত্ত্বগুণ) উপাধি হইলে স্বরূপে কোনও ক্ষতি আছে, ইহা (বলিতে পারা যায়) না। (কারণ) তমঃ আবরক, রজঃ বিপরীত জ্ঞানের হেতু ; সত্ত্ব কিন্তু আবরকও নহে, অন্যথাজ্ঞানের হেতুও নহে, উপরন্ত যথার্থ বাঞ্ছিত স্বরূপপ্রকাশের পক্ষপাতীই। অতএব সচ্চিদানন্দানন্তবিগ্রহ বাসুদেব নামক বিষ্ণুই ঈশ্বর। এই হেতু বৃদ্ধ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য "জগতে যাহা কিছু গতিশীল (চঞ্চল), এসমস্তই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদনীয়", এস্থলে উপপদহীন ঈশ-শব্দের সঙ্কোচ ইচ্ছা না করিয়া, ঈশ্বর-পদ ব্যাখ্যাকালে নিরতিশয় হেতু (তিনি) সকলের নিয়ন্তা নিশ্চয় করিয়া "পরমেশ্বর" "পরমাত্মা" এই শব্দদ্বয় দ্বারা "নারায়ণ পরব্রহ্ম, নারায়ণ পরমাত্মা" এই শ্রুতি হেতু বিষ্ণুই প্রতিপাদিত হইয়াছেন। "'ক' শব্দে প্রজাপতি উক্ত হইয়াছেন, সকল দেহীর আমিই 'ঈশ' ; আমরা দুইজন তোমার শরীর হইতে উৎপন্ন, এজন্য (তুমি) 'কেশব'-(ক+ঈশ=কেশ+'মত্বর্থীয়' ব) নামধারী" এই শিববচন হেতু তাঁহারই (বিষ্ণুরই) পরমেশ্বরত্ব-নির্ণয় হেতু তিনিই 'আবাস্য' বাস করিবার যোগ্য স্থান অর্থাৎ (বস্তুর) সত্তার স্ফুরণপ্রদানকারী আধার ; অথবা সেই এই পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু সকল জগতে জগৎ, তাহারই 'আবাস্য' আচ্ছাদন করিবার যোগ্য বা ব্যাপ্য অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনে অনুগত তাহার ধারণকারী স্বপ্নপ্রবঞ্চতুল্য। এস্থলে জগতী-শব্দ পৃথিবীবাচক (হইয়া) সমস্ত ভূত ও ভৌতিক প্রপঞ্চের উপলক্ষণ বা নির্দ্দেশক ; এবং জগৎশব্দ "(যাহা) গমন করিতেছে, (তাহা) জগৎ" এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা দেহান্তর্গত প্রবৃত্তিশীল ইন্দ্রিয়াদির উপলক্ষণ বা নির্দ্দেশক ; তাহাদের (উভয়েরই) নিজের নিজের নিয়ন্তা ঈশ্বরের অনুগত (অধীন) হওয়া উচিত। আধিদৈবিকের দ্যোতক এই 'ঈশ'শব্দ দ্বারা এবং তিনিই সকলের আবাস-স্থল বলায় "যাঁহাতে ভূতসকল বাস করে তিনিই 'বাসু'" এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা সকল (বস্তুর) বাসুদেব কর্ত্তৃক নিয়মন ও তাঁহাতে অধিষ্ঠান ধ্বনিত হইতেছে। বাসুদেব প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান হইলে প্রপঞ্চে সেই বাসুদেব-বিগ্রহের প্রতীতি হওয়া উচিত, ইহা বলিতে পার না। শুক্তির "ইদং" (পরি-দৃশ্যমান) অংশের রৌপ্যপ্রতীতি হইলেও (উহার) নীল-পৃষ্ঠাদির যেমন প্রকাশ হয় না, সেইরূপ ; তাই এই ব্যাপক বিগ্রহের অব্যক্ততা ভগবান কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে,— "অব্যক্তমূর্ত্তি আমা কর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত ; কিন্তু আমি সকলের নিকট প্রকাশিত হই না"। কেহ কেহ আবার তিনের (ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের) ঐকাত্ম্য হইলেও "'অথবা যাঁহার পাদনখ হইতে বিগলিত, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক (কমণ্ডলুতে) সংগৃহীত পূত অম্ভঃ (বারি), ঈশান সহ জগৎকে পবিত্র করে।' 'মুকুন্দ ব্যতীত জগতে অন্য কে আর ভগবান আছেন'?" ইত্যাদি শ্লোকবিচারের দ্বারা দুয়ের সেবকত্ব, (আর) একেরই সেব্যত্ব বলেন ; তাঁহারাও কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুয়ের অনীশ্বরত্ব প্রতিপাদন করেন না।

কদাচিৎ ব্রহ্মার যে জীবত্ব সম্ভাবনা করা হইয়াছে, তাহা কোনও কল্পে কোনও বিশিষ্ট শক্তিশালী জীব উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মত্ব লাভ করেন, এই অভিপ্রায়ে বলিয়া সকলই দোষরহিত হইল।

এখন, অধুনাতন কোন শৈবধর্ম্মাবলম্বী অদ্বৈত পরমানন্দ-তত্ত্ব শিবস্বরূপে চিত্ত সমবধারিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের নিগুর্ণত্ব শ্রবণ করিয়া যে কুপিত হইয়াছিলেন, তাহা ভাল শোভা পায় নাই; (কারণ) যাঁহারা অদ্বৈত-তত্ত্বের অনুশীলন করেন, একত্বদর্শীর "সেই (একত্বদর্শনে) মোহ কি, শোক কি?" ইত্যাদি শ্রুতি হেতু কোপাদি বিষয়ের নিরূপণ না হওয়ায়। 'কৈবল্যাদি উপনিষদ কি দেখেন নাই এবং ইতিহাস-পুরাণাদিও কি অবলোকন করেন নাই?' তিনি যে এই আপত্তি তুলেন, তাহাও বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত অনুকূল নহে। কারণ, বহু গ্রন্থকলার অভ্যাস-বর্জ্জন ভক্তির অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে, "বহুগ্রন্থ অভ্যাস করিবে না" এই স্মৃতি হেতু বহু গ্রন্থের কথারূপ কন্থা-রোমন্থন বৃথা; "তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির যত্নপূর্ব্বক কি অনুসন্ধান করা উচিত?—অন্তরস্থ জ্যোতিঃ" ইত্যাদি উক্তি হইতেও (বহু গ্রন্থাভ্যাস বৃথা)। এইরূপ, শিবের অনীশ্বরত্ব কোন বৈষ্ণবই প্রতিপাদন করেন নাই। ত্বম্-পদার্থেরও বস্তুত সগুণত্ব হইতে পারে না, তৎপদার্থের লক্ষ্য সদানন্দঘন শিবের কথা আর কি বলিব? আর যে, ক্রোধের বশে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির শিব হইতে অভিব্যক্তি উক্ত হইয়াছে, তাহাও তাহাদের (বৈষ্ণবদিগের) বিরোধের কারণ হয় না, (যেহেতু) গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণুই শিব এবং মৎস্যাদির (অবতারের) অবতারী।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের শিবভক্তত্বপ্রতিপাদক এই শৈবকে কোন পৌরাণিক বৈষ্ণব প্রশ্ন করিতেছেন, নিত্যধামস্থিত নিত্যলীলাযুক্ত অখিল সৌভাগ্যশালী সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ যোগেশ্বরদিগের ঈশ্বর ভগবান কোন কালে শিবের পূজা করিয়াছিলেন কি? অথবা বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগান্তর্গত দ্বাপরে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া (শিবের পূজা করিয়াছিলেন)? প্রথম (পক্ষ) নহে; কারণ তাঁহার (নিত্যধামগত বিষ্ণুর) স্বধামবিহার ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্মের সম্ভাবনা নাই। কোন স্মৃতি বা শ্রুতি কর্ত্তৃক স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত তাঁহার (বিষ্ণুর) অন্যের আরাধনা দেখান হয় নাই। "তাঁহার প্রকাশ দ্বারা এই সকল প্রকাশিত হইয়াছে", "তাঁহার কার্য্য (শরীর) বা করণ (ইন্দ্রিয়) কিছুই নাই", "(তিনি) বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ", "নিখিল ভূত তাঁহার (এক) পাদ, দ্যুলোকে ইহাঁর ত্রিপাদ অমৃতভূত" ইত্যাদি শ্রুতি তাঁহাকেই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর বলিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষে, "আমি যদি কর্ম্ম না করি, সঙ্করের কর্ত্তা হইয়া পড়িব", এই উক্তি অনুসারে লোকসংগ্রহের নিমিত্ত নানা কর্ম্ম করিয়া দুষ্টবিনাশ ও সাধুসংরক্ষণ দ্বারা ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ স্বয়ং অবতীর্ণ হন। এইজন্যই (শ্রীকৃষ্ণ) ব্যাস, নারদ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরও চরণবন্দন ও পূজাদি করিয়াছেন। এজন্য "লোকে যেমন (ধনশালী নৃপাদি অনেকে বিনা প্রয়োজনে লীলাবশতঃ আহারবিহারে প্রবৃত্ত হয়), তেমনি (প্রয়োজন ব্যতীতও এই সৃষ্টিকার্য্য ভগবানের) কেবল লীলা" ইত্যাদি (ব্যাসসূত্রে প্রদর্শিত) যুক্তিহেতু (শ্রীকৃষ্ণের) পরমেশ্বরত্বহানি বা তাঁহাদের (ব্যাস-নারদাদির) ভক্তত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না; যেহেতু তাঁহারাও (ব্যাস-নারদ প্রভৃতি) (শ্রীকৃষ্ণকে) পরমেশ্বররূপেই সম্মান করিতেন। আরও, শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসাদির ভক্ত ইহা অপ্রসিদ্ধ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণভক্ত ইহা অতি প্রসিদ্ধ। সেইরূপ, শিব গঙ্গাধর বলিয়া বিষ্ণুভক্ত ও ঈশ্বর ইহা প্রকটিত; এবং বিষ্ণু শিবভক্ত হইলেও পরমেশ্বর; অতএব বিবাদের কোন অবসর নাই।

হরিহরের উপাসক যে ব্যক্তি বৈষ্ণব ও শৈব কর্ত্তৃক বিষ্ণু ও শিবপ্রতিপাদক শ্রুতিস্মৃতি বাক্যসকল (পরস্পরের) স্তুতি ও নিন্দাপর ইহা মনে করিয়া বিষাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ সেই সকল বাক্য নিন্দাপর নহে, যথাযথ স্বরূপ-নির্ণায়করূপে অবগতি হেতু স্তুতিপররূপে শ্রবণে বিষাদ উচিত নহে। তিনি (হরিহরোপাসক) স্বয়ংই দুইয়ের (হরিহরের) ঐকাত্ম্যপ্রতিপাদক স্তুতিপর বাক্যসকল পাঠ করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে অতি বিস্তৃতির প্রয়োজন নাই। যাহারা চোখে কেবল পক্ষপাত দেখিয়া মোহগ্রস্ত হয়, সেই পরদুঃখে দুঃখিতচিত্ত করুণার সাগর হরিহরউপাসকদিগের প্রতি অনুগ্রহপরবশ প্রত্যক্তত্ত্বজ্ঞ বৈদিক আচার্য্যকল্প মায়াকার্য্যরূপে একত্বদর্শী নামেমাত্র শৈব ও বৈষ্ণবগণ সত্য আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া অধিষ্ঠান সত্তা দ্বারা সত্যের ন্যায় প্রকাশমান আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত "নামরূপ" পরিচ্ছিন্ন পদার্থসকলের যথোক্ত শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদন করতঃ নিত্য বিজ্ঞান ও আনন্দ যাঁহার শরীর তিনিই (সকলের) আধার বলিয়া দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত বস্তুর সুখানন্দরূপত্বে যাঁহাদের কোন সন্দেহ উৎপন্ন হয় না, তাঁহারা আনন্দপ্রাপ্ত ও পরম মঙ্গলপরায়ণ হইয়া সুখে বিজয়লাভ করুন। যাঁহাদের চিত্ত বৈরাগ্যযুক্ত, তাঁহাদের কাহারও সেই মত অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। ইহার অনুসন্ধান না করিলে রাগ-দ্বেষাদি "ক্লেশে"র অপগম না হওয়ায় আত্মজ্ঞানের

অন্যতম ফলান্তর বৈরাগ্যাদির অভাব হেতু যাহারা কেবল বিতণ্ডা, ছল ও নিগ্রহে আগ্রহরূপ জলচরের দ্বারা গৃহীত শুষ্কতার্কিক, তাহাদিগেরও "এই বুদ্ধি তর্ক দ্বারা প্রাপ্য নহে", "তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হেতু" এই শ্রুতি ও সূত্র শ্রবণ করিয়া নিজের মত পরিত্যাগ করতঃ অন্যতম (মতের) অনুসন্ধান করাই উচিত, কিন্তু উপেক্ষা কর্ত্তব্য নহে। শর্করাক্ষ-পুত্র (জন) ও অরুণ-নন্দন (উদ্দালক) প্রভৃতি, যাঁহারা (ব্রহ্মের কেবল) উদরগর্ত্তের উপাসক, (ঐ) উদরগর্ত্ত প্রভৃতির উপাসনার চিত্তশুদ্ধির সাধনরূপে অভিধান হেতু তাঁহাদের (অন্যমতানুসন্ধান) তো ভাবী ফলরূপে আদরণীয়ই। অখণ্ডানন্দস্বরূপ ভগবানের সেবাই চিত্তশুদ্ধির ফল, ইহাও বলা হইয়াছে। অতএব "সেই ঔপনিষদ পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি", "তাঁহাকেই জান, অন্য বাক্যসকল পরিত্যাগ কর", "উহা বাক্যসকলের গ্লানিজনক মাত্র", "তাঁহাকেই জানিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, মুক্তিলাভের অন্য কোন পন্থা নাই", "এককে জানিলে সমস্ত জানা হয়", "একদেব সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা" "এখানে নানা কিছুই নাই", "সজাতীয়-বিজাতীয়দ্বিতীয়রহিত এক ব্রহ্ম", ইত্যাদি শ্রুতির অর্থদর্শী শ্রৌতমার্গে অভিনিবিষ্টচিত্ত একদেশী মুমুক্ষুদিগের তাহাতে বিবাদের অবসর নাই।

যাহারা কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগ করে নাই, দুষ্ট বাসনায় চিত্ত যাহাদের আসক্ত এবং শুষ্ক কর্ম্মে যাহারা কর্ম্মঠ, তাহাদিগের যাহা ভাল লাগে না, তাহাতে জগতের অনির্ব্বাচ্য জ্ঞানকারণত্ববাদী ব্রহ্মবিদ্‌গণের কোন ক্ষতি হয় না; যেহেতু সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই অধিকারী। ইহা হইতে অন্য (মতাবলম্বী) ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত দেবতাদি স্থাবর পর্য্যন্ত বস্তুমাত্রদর্শী চিৎশক্তির অধিপতি ভগবানের সুখানন্তস্বরূপে বিবাদকারী ব্যক্তিগণ নামরূপাত্মক বস্তুসকল সত্যরূপে দেখিয়া (ইহলোক ও পরলোকে) পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করতঃ কেবল ক্লেশভাগী হইয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে সকল বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী "দ্রষ্টার দৃষ্টির কখনও নাশ হয় না", "চিচ্ছক্তি ভিন্ন বস্তুসকল ক্ষণপরিণামী", "মুক্তগণও লীলাবশতঃ বিগ্রহ (ধারণ) করিয়া ভগবানের ভজনা করেন", এই সকল উক্তি দেখিয়া চিৎশক্তির কার্য্যরূপে ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি পরম সত্য বলিয়া অনুভব করেন এবং আধার-সত্তা দ্বারা সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বলিয়া মায়িক বস্তুসকল মিথ্যা বলিয়া থাকেন, উপনিষদমতাবলম্বী কর্ত্তৃক অনুগৃহীত, ভগবানের সেবাতে অনুকূলচিত্ত, জগজ্জীবের অনুগ্রহপরবশ, ব্রহ্মবিদ্যাভিজ্ঞ যোগভ্রষ্টকল্প, তাঁহারা কৃতার্থ। তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন স্তুতি অভিনন্দন সেবা ও পরিপ্রশ্নাদি দ্বারাও মুমুক্ষুদিগের অত্যন্ত মঙ্গল হইয়া থাকে।

ধর্ম্মসাধনে রামমোহন-নির্দ্দিষ্ট সহজ পন্থা।

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ)

রামমোহন মানবের শাশ্বত সহজ সাধনার বিষয় নির্দ্ধারিত করে দিয়েছেন; কিন্তু সে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হব কেমন করে? বোঝা গেল, পরব্রহ্মের উপাসনাই মানবের একমাত্র কর্ত্তব্য; কিন্তু উপাসনা কেমন করে কর্‌ব? পন্থা কি? যে পথে অগ্রসর হলে অনন্ত মহাসমুদ্র অতিক্রম করে অভীষ্ট নন্দন-কাননে উপনীত হব; যেখানে গেলে পরমপিতার স্নেহচ্ছায়ায় শুষ্ক তপ্ত জীবনের সমস্ত সন্তাপ দূর হয়ে যাবে শীতল চন্দনপ্রলেপে; যেখানে গেলে দীন কাঙ্গাল অমূল্য পৈত্রিক ধনের সন্ধান পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে কর্‌বে?

মানবের সে সমস্যাও মহামনীষী রামমোহনের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। রামমোহন শুধু বিষয়নির্দ্ধারণ ক'রে, সহজ দাবীর অধিকার প্রতিপন্ন করে নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি পথেরও নির্দ্দেশ করেছেন; ব্রহ্মকৃপালাভের উপায়ও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই উপায় জন্মগত সাধনাধিকারের মতই সহজ সাধন-পন্থা।

সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ পণ্ডিত মহামতি ফ্রোবেল বালকবালিকাগণের শিক্ষার সহজ সরল কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী উদ্ভাবন করেন। এই শিক্ষার বিশেষত্ব খেলাধুলার মধ্য দিয়ে, স্থূল উদাহরণের ভিতর দিয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ে শিশুর প্রাণের যোগসাধন; কোনরূপ কষ্ট কল্পনা এই শিক্ষার অঙ্গীভূত নয়; পরন্তু সূক্ষ্ম বিষয়কে স্থূলে রূপান্তরিত করে, শিশুর প্রাণের দ্বারে পৌঁছে দিয়ে শিশুর কৌতূহল বৃদ্ধি করাই এই শিক্ষার একমাত্র কার্য্য।

রামমোহনের সহজ সাধন পন্থাও ফ্রোবেল-নীতির অনুরূপ। তিনি উপলব্ধি করলেন, যে সমস্ত সাধন পন্থা মানবের পুরোভাগে দেখা দিয়েছে, তৎকালপ্রচলিত সমস্ত পন্থাই কঠোর ও জটিল,—আসন প্রাণায়াম ধ্যান ধারণা সমাধির মধ্য দিয়ে অষ্টাঙ্গযোগের সহায়তায় অভীষ্ট বস্তু অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য; বর্ত্তমানের দুঃখদৈন্যনিপীড়িত মানবের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়; আচার্য্য শঙ্করপ্রবর্ত্তিত বৈদান্তিক জ্ঞানমার্গের পথও সুগম নয়, বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যেও তাঁর অনুসন্ধিৎসা সুগম পথ খুঁজে পেলো না; কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকরাচার্য্যের কর্ম্মকাণ্ডের বিপুলতায় তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। অবশেষে ঘনান্ধকারের অবসানে যেমন প্রাচীমূলে উষার স্বর্ণকরাঘাত জীবের মোহঘুম অপসারিত করে আনন্দের বাণী বহন করে নিয়ে আসে,

রামমোহনও তেমনি আমাদের সৌভাগ্যসূর্য্যের অভ্যুদয়ে উপনিষদের রুদ্ধ মন্দিরদ্বারে করাঘাত করে যখন তা' উন্মুক্ত করলেন, তখন দেখতে পেলেন অভিনব সহজ সাধন পথ দেখতে পেলেন, কঠোরতা-বর্জ্জিত সরল উপাসনা-পদ্ধতি; নিয়ে এলেন সন্তপ্ত জীবকুলের মুক্তিকামনায় জ্ঞানযুক্ত ভক্তিমার্গের অপরূপ দান। উদাত্ত গম্ভীর মন্ত্রে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করে, সপ্ত সমুদ্রের বারি-রাশি বিলোড়িত করে, হৃদয়ে হৃদয়ে অজানা পুলক-স্পন্দন জাগিয়ে দিয়ে রামমোহন গাইলেন—

"অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়
আবিরাবীর্ম্ম এধি ॥"

শক্তিহীন আমরা দুর্ব্বল অবশচিত্ত শিশু; হে পর-মাত্মন্, সাধনপ্রভাবে তোমার নিকটে উপনীত হবার, তোমার করুণারসধারা লাভ কর্ব্বার ক্ষমতা আমাদের নেই। অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর তুমি। সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ তুমি। হে পরম পিতা! দুর্ব্বল শিশু যেমন পিতামাতার উপর নির্ভর করে স্বচ্ছন্দে বিপদের সম্মুখীন হতেও ইতস্তত: করে না, কারণ সে জানে পশ্চাতে পিতামাতা বর্ত্তমান, যাঁরা তাকে বিপদনির্ম্মুক্ত করে রক্ষা কর্ব্বেন, আমরাও তেমনি তোমাকেই আত্মসমর্পণ কর্‌ব। তুমি তোমার মঙ্গল-হস্ত সম্প্রসারিত করে আমাদিগকে রক্ষা কর; আমা-দিগকে অসৎ হ'তে সৎস্বরূপে নিয়ে চল।

কায়মনোবাক্যে পরব্রহ্মে আত্মসমর্পণই রামমোহনের সহজসাধন পন্থা। এই সাধনে বিধিনিষেধের বাহুল্য আমাদিগকে নিপীড়িত করে না; কর্ম্মকাণ্ডের বিপুলতা মনকে ভারাক্রান্ত করে না; শুষ্কজ্ঞানের নৈরাশ্য হৃদয়কে উদ্বেলিত করে না; অষ্টাঙ্গযোগের কঠোরতায় প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয় না। এই সাধনে সময়ের বিচার নেই; তিথিনক্ষত্রের বাঁধাধরা গণ্ডী নেই,—আছে সহজ সরলভাবে প্রাণের নিবেদন; পিতা বলে, মাতা বলে, বন্ধু বলে পরব্রহ্মের সহিত প্রাণের যোগসাধন। যে কোন মুহূর্ত্তে, যে কোন কালে, যে কোন অবস্থায় মানব এই সাধনপথে অগ্রসর হতে পারে। যে কোন ভাষায়, যে কোন বাক্যে মহাপুরুষের চরণে প্রাণের ব্যাকুলতা জানালে, তা তাঁর চরণে উপনীত হবেই হবে।

আর ভয় নেই। আর আতঙ্ক আমাদিগকে বিচলিত করবে না। রামমোহনের জীবনব্যাপী সাধন-বলে, তিনি দিয়ে গেছেন আমাদিগকে সহজ সাধনাধিকারের দাবী, আর সেই অধিকারলাভের সহজ সাধনপন্থা।

নব শতাব্দীর দুর্গম পথে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হয়েছে। কোটি বৎসর কালসাগরে বিলীন হয়ে গেছে। পুরোভাগে কোটী কোটী নবীন বর্ষ, নবীন বাণী নিয়ে অমৃতভাণ্ড-করে সমুপস্থিত হবে। সহজ সাধন পন্থা অনুসরণ করে জন্মগত অধিকারলাভে আমরা কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছি, আজ তা দেখবার সময় উপস্থিত। পরব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের প্রাণের যোগ সাধিত হয়েছে কি না, তা আমাদিগকে দেখতে হবে এবং তাই দেখে অনাগত ভবিষ্যের বক্ষ থেকে যে শতাব্দী নবীনতার সজীব মূর্ত্তিরূপে উপস্থিত হয়েছে, সেই শতাব্দীর কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করতে হবে।

যদি পর্য্যালোচনা করে দেখি, যে শতাব্দী চলে গেছে অতীতের বুকে, সে শতাব্দীতে আমরা বিশেষ অগ্রসর হ'তে পারিনি—ব্রহ্মের সঙ্গে প্রাণের যোগসূত্রের সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপিত হয় নি; তাতেই বা আমাদের ভীত বা লজ্জিত হবার কারণ কি? তবে ভক্ত উপাসকমণ্ডলী সঙ্গে নিয়ে আমাদিগকে নবশতাব্দীর জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে, যেন এই শতাব্দীও গত শতাব্দীর মত ব্যর্থ না হয়; বর্ত্তমান শতাব্দীতে যেন ব্রহ্মের চরণে আত্মসমর্পণ করে, রামমোহন নির্দ্দিষ্ট সহজ সাধনপথে অগ্রসর হ'তে পারি।

নববশতাব্দীর মৃদুল দক্ষিণ পবন পুষ্প গন্ধ বহন করে আমাদের প্রাণে ব্রহ্মকৃপা বিতরণ করুক। আকা-শের প্রান্ত হ'তে প্রান্তান্তর সংযুক্ত করে, যে অনন্ত নীহারিকাপুঞ্জসমন্বিত জ্যোতিষ্কমণ্ডল জ্যোতি বিকীর্ণ করছে, সেই জ্যোতিষ্কমণ্ডল সাধকমণ্ডলীর হৃদয়ে হৃদয়ে পরব্রহ্মের জ্যোতি ফুটিয়ে তুলুক। রাজা রামমোহন এবং সহজ সাধন পন্থার মূর্ত্ত প্রতিচ্ছবি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শাশ্বত শান্তির আধার অমৃতময় ব্রহ্মলোক হ'তে ভক্ত-মণ্ডলীর প্রাণে এক সহজ সাধনস্পৃহা জাগিয়ে তুলুন।

পশ্চাতে অনন্ত অতীত, পুরোভাগে অনাগত ভবিষ্যৎ, মধ্যভাগে বর্ত্তমানের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আমরা। হে পর-মাত্মন্, বর্ত্তমান নবশতাব্দীর প্রারম্ভে তোমার করুণাধারা আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত কর, তোমার পুণ্য চরণে আত্মনিবেদন করে কৃত-কৃতার্থ হই।

THE

BRAHMA SAMAJ

UNDER

DEVENDRANATH THAKUR.

CHAPTER II.

(7)

85. Brahma Vidyalaya established 1781 *Saka* (1859 A.D.).

In the same year the Brahma Vidyalaya, an institution for the training of Brahmos, was established at Calcutta, according to the suggestion of Keshub Chunder Sen. Devendranath Thakur and Keshub Chunder Sen used to deliver lectures here in Bengali and English respectively on every Sunday. Devendranath's lectures are contained in a book called *Brahma Dharmer Mata O Viswasa, i. e.* the Doctrines, and Principles of Brahmaism. The subjects of the lectures are as follow :—

1. On the Existence and Attributes of God.
2. God in relation to the Universe as its Creator, Preserver, and Destroyer.
3. God is pure felicity.
4. God is truth.
5. Love of God and restrainment of inordinate fondness for wordly objects.
6. Wordly bliss and Divine bliss.
7. Future state.
8. Heaven and Hell.

9 & 10. True Salvation.

Here in this Vidyalaya Keshub Chunder Sen also gave a course of lectures in English, on the Ethics and Theology of Brahmaism to the young collegians of Calcutta, and issued a series of tracts in English chiefly expository of the principles of Brahmaism, for the benefit of his youthful countrymen.

86. Hymns by Satyendranath Thakur.

It was at this time also that the second son of Devendranath Thakur, Satyandranath Thakur, began to compose those immortal hymns which stir the soul to its profoundest depths, and, making it forget the world and all its cares, "lap" it in heavenly bliss.

87. Remodelling of domestic rites.

Although we have thus far endeavoured to show the rapid strides Brahmaism had taken in all directions, we have now to narrate the most important reform of all, and one which had often been deliberated by the *Samaj*—the remodelling the *Grihanusthana*, or domestic rites and ceremonies.

88. Brahmaism was a religion of pure theory before now.

Hitherto Brahmaism with all its improvements had continued to a great extent to be a religion of pure theory and speculation, without advancing any way in adapting itself to actual life and its practical phases. One solitary exception to this is the performance of a *Sraddha* by Devendranath Thakur on monotheistic principles as related above. "The external social life of Brahmas," says Miss Collet, "differed but little from that of their polytheistic countrymen, many of them conforming to all those degrading sacraments of idolatry which are interwoven with ordinary Hindu life. Meetings had occasionally been held at the desire of some zealous young Brahmas, for the purpose of adopting the best means of terminating this unworthy conformity ; but the result of such meetings had always been in favour of the conservatives."

89. First Brahmic marriage.

When this important innovation took place, Devendranath was the first fearlessly to set an example, by marrying his daughter without any idolatrous rites.

90. No legislative act considered necessary to legalise Adi Samaj marriages.

The *Brahmas* of the *Adi Brahma Samaj* had for some time been endeavouring to procure a formal act of legislation to legalize *Brahma* marriages, but on further consideration the attempt was abandoned as useless, because they were of opinion that marriages solemnized according to the form of the *Adi Brahma Samaj* being as much Hindu marriages as those in vogue, were equally as valid as any marriages performed under a legislative act.

91. Non-idolatrous act by Devendranath Thakur.

Besides thus setting the first example of a non-idolatrous mode of solemnizing domestic ceremonies in his own family, Devendranath Thakur showed two other instances of his moral courage, by removing his family idol from his house, and discarding the sacred thread, the distinctive mark of a Brahmin, and the higher castes.

92. *Anusthan-Padhati* on non-idolatrous basis—first promulgated by Devendranath Thakur.

But this was not all he did. All Hindu domestic ceremonies, says Rajnarain Bose, were subjected to the scrutiny of the *Samaj* and remodelled by Devendranath now on the Brahmic plan. Only those portions of the old ritual which could be kept consistently with the dictates of conscience were retained, and the others rejected. The following are the principal sacraments called *Sanskaras* in the original which were remodelled :—

1. *Jatakarma* or the ceremonies on child-birth.

2. *Namakarana*, ceremony of giving a name to the child.

3. *Upanayana*, placing of a boy for religious instruction, under a proper tutor, and his investiture in an unidolatrous manner with the sacred thread in the case of a Brahmin, as a symbol of his initiation into the monotheistic Mantra, the Gayatri, observed by the twice-born from earliest antiquity. A Brahma of Brahmin descent may, after putting on the Poita in an unidolatrous way, if he chooses, renounce putting it on his person for ever.

4. *Diksha*, initiation into the Brahma religion by reading out the Brahmic covenant before a Brahmic minister.

5. *Vivaha*, or marriage ceremony. It contains among other remodified rites the *Saptapadigamana*, or walking of seven steps togather by the married couple, as enjoined by Bhavadeva Bhatta with some modifications.

6. *Antyesthi*, or funeral ceremony, which in modern times is found to differ so widely from the ancient rites presented in the Vedas and Grihya Sutras.

7. *Sraddha*, consisting of prayers for the dead and bestowing of alms to the poor, etc., in their memory.

93. Non-idolatrous but national basis.

In all these, the renunciation of the idolatrous parts of the rites is imperative on every Brahma, but conformity to social practices and usages is left wholly to the option of the person himself.

94. Devendranath's voyage to Ceylon—*Saka* 1783 (1860 A.D.)

During the Durga-Puja holidays of 1860 (Saka 1783), Devendranath proceeded on a voyage to Ceylon in company with his second son, Satyandranath Thakur, Keshub Chunder Sen, another friend, and servants for the purpose of recruiting his health. Although his health was not at all good at the time, he did not fail to pay visits to the Buddhist temples in the vicinity of Galle and hold conversations with the priests in whose charge they were placed. An interesting account of these conversations is given in a number of the *Tattwabodhini Patrika* of the time in a description of the trip from the pen of Satyendranath Thakur.

95. Buddhism as found in Ceylon.

It is a curious fact in the history of Brahmaism that Rammohun Roy came in contact with Buddhism in the north of India, and Devendranath Thakur in its south. Of Thibet and Ceylon, the latter, however, affords better opportunities for studying Buddhism than the former. The Buddhism of Ceylon is represented in the Lalita-Vistara to be coeval with the life of Sakya Moni himself, and presents an older form of that faith, than is to be found in all its various schisms. The celebrated edict of Asoka makes mention of the early propagation of Buddhism in this island. more over, the Buddhistic scriptures of Ceylon are written in the dialect of Prakrit Lankeswara, which is near allied to the Pali, and the present Singhalese, which is an Aryan dialect, and are more easily intelligible to a student of Sanskrit than their versions in Tibetan or Burmese. Devendranath and Satyandranath, during their brief stay in the island, did not fail to make inquiries into both the religion and the language of the country. Specimens of the Singhalese language are

given in the number of the *Tattwabodhini Patrika* containing the account of the trip.

96. Keshub Chunder ordained Acharya—*Saka* 1783.

At the end of 1783 Saka, Keshub Chunder Sen was ordained an Acharya or Minister of the Church, by the Pradhan Acharya Devendranath Thakur.

97. Brahmikas first join public service—*Saka* 1787 (1865 A. D.)

At the anniversary service of the *Samaj* in 1787 Saka (1865), some Brahmikas, or female Brahmas, called at the *Adi Brahma Samaj* to join the service. They were accommodated with seats behind a screen, and since then a regular private entrance with a staircase has been constructed towards the east of the *Adi Samaj* Hall, to enable the female Brahmas to enter the *Samaj* without being seen, on occasions of public festivals. The practice of women joining with Men in public worship is not uncommon in India. In Upper Hindusthan, Bombay and Madras, and in places of pilgrimage in Bengal, women of rank are seen to mix with men in temples for purpose of such worship.

98. Civil Marriage Act—1872 A. D.

When, in 1872, Government wanted to pass a Brahma marriage law applicable to all Brahmas, requiring parties desirous to marry to appear before a Registrar of Brahma marriages and getting their marriage registered by him, the members of the *Adi Brahma Samaj*, deeming themselves as much Hindu as the rest of the community and not wishing to be "ticketted" to quote the apt expression of a journalist of England in his remarks on their conduct on the occasion, as Brahmas, applied to Government for exemption from the operation of the intended Act. Babu Nobogopal Mitter, Editor of the *National Paper*, rendered great service to the *Samaj* by his indefatigable exersions for procuring such exemptions and getting a separate law, that is, the Civil Marriage Act passed for the benefit of the Brahmas of the Samaj of India, Sceptics and Atheists.

99. Paudit Ajoddhyanath Pakarshi.

On the 29th of August 1872, died Pundit Ajoddhyanath Pakrasi, a Minister of the *Adi Brahma Samaj*, and one of the principal coadjutors in his time of Babu Devendranath Thakur in the *Brahma Samaj* movement. Born at Malpara in the Hugli district and educated in a common *tol*, he was at first engaged as a translator of the Mahabharat by Kali Prasanna Sing. Chancing to attened one Wednesday the *Adi Brahma Samaj*, he was much struck with the simplicity of the worship, and the nobleness of the doctrines expounded by the Minister in his sermon. He at once embraced Brahmaism, and became so attached to the religion that he performed the Shraddha of his deceased father in the Brahma way. He latterly acted as a Minister of the *Brahma Samaj* and the Editor of the *Tattwabodhini Patrika*. He was an effective speaker and an able writer. His eloquent sermons attracted overflowing congregations to the *Samaj*. His articles in the *Patrika* and his Brahma Vidyalaya discourses as well as his treatise on the "Purpose of Existence" are written in a simple and beautiful style aud dispaly remarkable ability,

100. Charge of Adi Brahma Samaj made over to Dijendranath Thakur *Saka* 1794 (1872 A.D.).

We have now followed the career of Devendranath Thakur from Saka 1763 (A.D. 1842), to Saka 1794 (A. D. 1872), when he made over charge of the *Samaj* to his son Dijendranath, though still retaining a deep interest in the *Samaj*, and according it his advice and assistance whenever needed.

101. Devendranath Thakur and his work of thirty years—1763-1794 *Saka*. (1842-1872 A. D.).

During this period of 30 years, we have endeavoured to show what reforms and changes were made in the Original *Samaj*, and what extensive dimensions it had assumed under the fostering care of Devendranath Thakur. After a lapse of 30 long years from a small body of disheartened and half-hearted followers we behold it to day,

a mighty organization, possessing the hearts and affections of the majority of the educated Hindus, and extending its branches far and wide into the Mofussil.* Gradually, and with calm and patient courage during these 30 years do we behold Devendranath Thakur applying with success the lancet of reform to the festering sores of idolatrous customs and ceremonies, when success appeared impossible. Gradually do we see him purging the *Samaj* of its idolatrous impurities and making it a pure Hindu monotheistic Church.

To those acquainted with the bigotry of the orthodox Hindu, these reforms of social rites and ceremonies exhibit moral courage of the highest order. Success or ruin were the only alternatives, and success was happily achieved because the man who attempted the reforms was unacquainted with failure and was actuated by the most disinterested of motives—the good and regeneration of his countrymen.

Though now grown old and delighting in the silent communion of his own soul with her Maker, the noble example of Devendranath Thakur is not forgot. Though absent, his deeds still animate the followers of the *Samaj*, and though no monument of brass or stone has yet been erected to commemorate the deeds of his noble and pious life, yet we opine that he can wish for no grander monument than the thought, that the thousands who throng the *Samaj* are justly proud of the man who 30 years ago boldly stood between the *Samaj* and ruin, and raised it to its present prosperous condition.

The lives of religious reformers of all ages are generally held up to us for admiration, and as examples for imitation. In the life that we have just attempted to delineate, there is much to admire and to imitate if possible. Born to an immensely wealthy inheritance, backed by the prestige of his talented father's name, and at the same time possessed of exceptionally high talents, Devendranath Thakur might if he chose have aspired to the highest of earthly honors. But to the glorious pinnacle on which his position and talent would have undoubtedly placed him, he preferred the more humble and incomparably the more difficult and glorious task of resuscitating and regenerating his country's ancient religion. Is there no good to be derived from a life and choice such as his, accompanied, as it has been, by the greatest piety and self denial? Can any earthly treasure be compared to the self satisfaction, the "eternal sun-shine" of the mind, arising form the perfomance of acts like those of Devendranath Thakur? The value of such actions is not properly estimated by men of the world, but it is by a superior tribunal, which awards them their proper reward in heaven, if men like Devendranath act from the hope of any reward earthly or heavenly, and not from purely disinterested motives.

102. Devendranath Thakur, Secretary to the British India Association—1852 A.D.

Devendranath Thakur was appointed Secretary to the British India Association at the time of its first establishment in 1852. Had he still retained connection wilh the said Association, he would, considering his talents, birth, and position, have, no doubt, by this time, been elevated to the rank of Maharaja. But he could not have in that case obtained, as a Brahma remarks, the much nobler title *Maharishi*, or the great *Rishi*, universally accorded to him by all classes of his countymen.*

ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন কথা।

বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, বি-এল)

মুরশিদাবাদের সান্নিধ্যে অবস্থিত বহরমপুর একটি বিখ্যাত জনপদ। আদালত ঐখানে অবস্থিত থাকায় অনেক সম্রান্ত ব্যক্তি তথায় অবস্থান করেন। ঐখানকার বিখ্যাত উকীল শ্রদ্ধেয় দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি সরকারি উকীল ছিলেন এবং মুরশিদাবাদের নবাব বাহাদুরেরও উকীল ছিলেন, তিনিই অপরের সহযোগিতায় বহরমপুরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের .বহু পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়ের একখানি সুচিন্তিত জীবনী প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর ২২এ মাঘ তারিখে সমারোহের সহিত সাম্বৎসরিক উৎসব হইত। আমার পিতা পরলোকগত

---

* Navavarshiki, p, 226,

বেচারাম চট্টোপাধ্যায় উপাসনাকার্য্য সম্পাদন জন্য তথায়
প্রাত বৎসর যাইতেন। স্বর্গগত বৈকুণ্ঠনাথ সেন প্রমুখ
যাবতীয় উকীলও অনেকে উৎসবে যোগ দিতেন।
প্রাতে ও সায়াহ্নে উপাসনা হইত। বিষ্ণুরাম চট্টো-
পাধ্যায়, যিনি "আমার মন ভুলাল যে কোথা গেল সে"
এইরূপ অমর সঙ্গীতরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তিনি
তখন তথাকার এক বালিকাবিদ্যালয়ে (যতদূর আমার
স্মরণ হয়) শিক্ষকতা করিতেন। তিনিই সঙ্গীত করি-
তেন। বড় বেলের খোলায় নির্ম্মিত তাঁহার একটি
এসরাজ ছিল। তাঁহার অপূর্ব্ব সঙ্গীতে উৎসব মধুময়
হইত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কয়েকবার বজরা যোগে
উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যাইলে আমার পিতার
সহিত বেদী গ্রহণ করিতেন। এক বৎসর উৎসবের
বেদী হইতে উপদেশ দিতে দিতে ভাবাবেশে তাঁহার
কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া যায়। আমার পিতাকে ইঙ্গিত
করিবামাত্র তিনি মহর্ষির উপদেশের শেষাংশ পূর্ণ
করিয়া দেন। ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া সঙ্গীত-
রচনায় বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অসাধারণ
প্রতিভার বিকাশ হয়। আমার পিতার মৃত্যুর পরেও
দীননাথ বাবু জীবিত ছিলেন, আমার পিতার প্রতি
প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তিনি যে একটি হাতীর
দাঁতে বাঁধান বাঁশের মূল্যবান লাঠি আমার পিতাকে
উপহার দেন, তাহা আজও আমরা সযত্নে রক্ষা করি-
তেছি। উৎসবে সঙ্গীতের সঙ্গে উক্ত দীন বাবুর এক
পুত্র অল্পবয়স্ক হইলেও পাখোয়াজ সুন্দর বাজাইতেন।
অতীতের এই সমস্ত সরস স্মৃতি পড়িয়া রহিয়াছে।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ।

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে শিবচন্দ্র দেব মহাশয় তাঁহার
বিদ্যাবত্তাগুণে ও অমায়িক ব্যবহারে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা
লাভ করিয়াছিলেন। সে সময়কার শিক্ষিতগণের প্রায়
সকলেরই ব্রাহ্মসমাজের উপর একটা প্রাণের টান
ছিল। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত ও ধনাঢ্য
ব্যক্তি তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইয়াছিলেন। শিবচন্দ্র
বাবুর আবাসস্থান কোন্নগরে। তিনি ডেপুটী কলেক্টর-
রূপে বিশেষ যোগ্যতার সহিত সরকারি কার্য্য সম্পন্ন
করিয়া আসিয়া সম্ভবত ১৮৫৮ বা ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে অবসর
গ্রহণ করেন। তাঁহার অবাস-নিকেতনে ব্রাহ্মসমাজ ও
ব্রহ্মোৎসব হইত। শিবচন্দ্র বাবুই উহার প্রতিষ্ঠাতা।
তাঁহার সুন্দর ও সুপরিচ্ছন্ন বাটীর প্রাঙ্গণে যে উৎসব
হইত, তাহাতে কোন্নগরের ও পার্শ্বস্থ গ্রামের বহুলোক
উপস্থিত হইতেন। আমার পিতাকে ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয়কে উৎসবে উপাসনা করিতে দেখিয়াছি। দুই-
একবার দেখিয়াছি, প্রসিদ্ধ গায়ক বিহারী বৈষ্ণবকে সঙ্গীত
করিতে। তিনি বেহালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবেও আমরণ
সঙ্গীত করিতেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতে সকলেই মুগ্ধ
হইয়া যাইত। আদিব্রাহ্মসমাজের উৎসবে অন্য গায়কের
গানের সহিত তিনি দুইবার সঙ্গীত করেন। "কঠিন
দুখ পাই হে মোহান্ধকারে" প্রভৃতি দুই তিনটি প্রসিদ্ধ
সঙ্গীতে তিনি সুরসংযোগ করিয়া দেন। উৎসবান্তে
শিবচন্দ্র বাবু সকলকে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার
করাইতেন।

সে সময়কার কোন্নগরে যাহা কিছু উন্নতি হয়, সক-
লেরই মূল শিবচন্দ্র বাবু। কোন্নগরে রেল ষ্টেশন, ইংরাজী
বিদ্যালয় প্রভৃতি নানা হিতকর কার্য্য তাঁহার দ্বারা
অনুষ্ঠিত। সকলেই শিবচন্দ্র বাবুকে ভয় ও সম্ভ্রমের
সহিত নিরীক্ষণ করিত। গ্রামের মধ্যে যে কিছু কলহ-
বিবাদ হইত, শিবচন্দ্র বাবুর মধ্যস্থতায় সবই মীমাংসা
হইয়া যাইত। তিনি চরিত্রে ও ব্যবহারে আদর্শ-
পুরুষ ছিলেন। মহর্ষির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ
ছিল। কোন্নগরে তাঁহার অসীম সম্ভ্রম ছিল। পরে
তিনি সাধারণব্রাহ্মসমাজের সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত
হন। সাধারণব্রাহ্মসমাজে মিলিত হইবার কিছু পূর্ব্বে
কেশব বাবুর সংস্পর্শে আসিয়া তিনি কয়েকটি গৃহ্য
অনুষ্ঠান ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করেন।
ঐরূপ ব্যবহারে গ্রামের লোক তাঁহার বৈরী হইয়া উঠে।
নিজ সমাজের ভিতরে তাঁহার যে আশ্চর্য্য প্রতিষ্ঠা
ছিল, তাহা বিনাশের মুখে দেখিয়া তিনি কোন্নগর পরি-
ত্যাগ করিয়া তাঁহার কলিকাতার Creek Row-স্থিত
বাটীতে চলিয়া আসেন। শিবচন্দ্র বাবু পরে কোন্নগরে
গঙ্গার তটদেশে একটি সুন্দর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।
উহার ব্যয়ের সাহায্যকল্পে মহর্ষি ৫০০৲ টাকা দান
করেন। শিবচন্দ্র বাবু কোন্নগর ছাড়িয়া দিবার পরে
তাঁহার সুশোভন আবাসনিকেতন ভগ্নদশায় উপস্থিত
হয়। কয়েক বৎসর হইল, অপরে উহা খরিদ করিয়া
লইয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান অধিস্বামী প্রতিবৎসর
উৎসবের সময় শিবচন্দ্র বাবুর বাটীর অংশবিশেষ সাধা-
রণকে ব্যবহার করিতে দেন।

মধ্যে কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ অবসন্ন-দশা প্রাপ্ত হইয়া-
ছিল। মাসে দুইএকবার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ
ভট্টাচার্য্য মহাশয় উপাসনা করিতে যাইতেন। অনেক
মফঃস্বল ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় বার্ষিক উৎসবের সময়
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজে কলিকাতা হইতে অনেকে

উপস্থিত হন। নিম্নে শিবচন্দ্র বাবুর লিখিত একখানি পুরাতন পত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আমার পিতাকে লিখিতেছেন—

আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সন্ধ্যার সময়ে কোন্নগর-ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। অতএব আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক মদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন। ইতি ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৭৮৬ শক।

(স্বাক্ষর) শ্রীশিবচন্দ্র দেব।

পুঃ—এই পত্র দ্বারা তথাকার সমাজস্থ সমস্ত ব্রাহ্ম-মহোদয়গণকে আহ্বান করা হইল, ইতি।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব।

এই সময়ে কোন্নগর সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমার পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে আদ্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ওঁ নৈনান

২১এ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৫ শক।

প্রিয়দর্শনেষু

আশীষ এই যে, সংসারপারে নির্ব্বিঘ্ন হউক।

বহুদূরের পথ হেতু কোন্নগরে সে দিবস তোমায় পাওয়া ঘটে নাই। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস (প্রসন্নকুমার) ও শীতল (শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) ও শ্রীনাথ (বন্দ্যোপাধ্যায়—সকলেই ভবানীপুরের) বাবুরা তথায় উপস্থিত ছিলেন। তথাকার সমাজে সে দিন উপাসনা করায় বোধ হয় তাঁহারা বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছিলেন। সেই নূতন দালানে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবু (দেব) অতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাদের সহিত একহৃদয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবুর অনুষ্ঠানে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং শুভকার্য্যেতে অনুরাগ বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। কোন্নগরে তাঁহার আবাস-স্থানে তাঁহার পিতৃপুরুষের নিকেতনে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করা তাঁহার জীবনের সঙ্কল্প। তিনি আমাকে সেদিন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময়ে বলিলেন যে, কেবল পর-ব্রহ্মের উপাসনার নিমিত্তে আমি এই দালান নির্ম্মাণ করিয়াছি। সপরিবারে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে তাঁহার অভিলাষপূর্ণ হইল। তিনি অতি শান্ত গম্ভীর ও বিনীত-স্বভাব। তাঁহাকে দেখিলে আমি বড় প্রীতি পাই। এখান হইতে সেদিন কোন্নগর যাইতে সমস্ত দিবস গত হইল। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবুর ঘাটের অনতিদূরে নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া গেল। সে আর এগোতেও পারে না, পিছাতেও পারে না। সেখানে প্রায় আমরা দুই ঘণ্টাকাল বদ্ধ হইয়া রহিলাম। নানা কষ্টে বেলা অবসান হইলে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবুর আলয়ে উপস্থিত হইলাম। ক্রমে সেই পল্লীগ্রামের শীতল ছায়া হইতে সেদিনকার দশমীর চন্দ্রকিরণ প্রতিভাত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মদিগের হৃদয় হইতে উৎসাহসমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই নূতন উপাসনামণ্ডপ বর্ত্তিকার আলোকে প্রদীপ্ত হইল এবং সাধু ব্রাহ্মদিগের সমাগম দ্বারা তাহা অলঙ্কৃত হইল। বেদীতে আচার্য্যেরা আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবু একটি লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিলেন এবং তথায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের সংবাদ সকলকে অবগত করিলেন। উদ্বোধনের পর সঙ্গীত আরম্ভ হইল এবং উৎসাহের অগ্নি উপাসনামণ্ডপের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল। উপাসনা কিছু দীর্ঘকাল হইয়াছিল; কিন্তু উৎসাহেতে সে কালের দীর্ঘতা কিছুতেই উপলব্ধি হয় নাই। পরে ভত রাত্রিতে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবু আমাদিগকে আহার করাইলেন এবং প্যারী বাবুর (সম্ভবতঃ প্যারীচাঁদ মিত্র) সমভিব্যাহারে আমাদের নৌকাতে ফিরিয়া আইলাম। এ উদ্যানে আসিতে প্রভাত হইয়া গেল। আমি একাকী সেই নৌকার ছাদের উপর বসিয়া দশমীর চন্দ্রের অস্তমিত মহিমা দেখিয়া অনন্তের মহিমা অনুভব করিতে ছিলাম।

(স্বাক্ষর) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

ধর্ম্ম ও সাম্যবাদ।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পরাধীনতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া পরাধীনতার মধ্যে লালিত পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইবার কারণে আমাদের মনোভাব দাসত্বের সহিত এরূপ বিজড়িত হইয়া গিয়াছে যে, বিজ্ঞানের ন্যায় দর্শন, ধর্ম্ম ও সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধেও স্বাধীন পাশ্চাত্য জাতিসমূহের কোন্ জাতি নিজেদের দেশে কোন্ প্রণালীর উপযুক্ততা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, আর আমরা বিনা বিচারে ও পরীক্ষায় তাহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া একটা মস্ত নূতন কথা পাইয়াছি ভাবিয়া নৃত্য করিতে বসিলাম। মধ্যে সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, রাশিয়া হইতে ধর্ম্ম বিতাড়িত হইয়াছে। আমরা বিচার করিয়া দেখিলাম না যে, ধর্ম্মের

নামে কোন পদার্থ নির্ব্বাসিত হইয়াছে, এবং মানবের অন্তরে ভগবদ্বিহিত প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম কোন দেশ হইতে নামেমাত্র নির্ব্বাসিত হইলেও কোন মানবের অন্তর হইতে উহা বস্তুত উন্মূলিত হইতে পারে কি না। এই সকল বিষয় বিচার না করিয়াই সেদিন ভারতের কোন জননেতা ঘোষণা করিতে দ্বিধা করিলেন না যে, ভারত হইতে ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত না করিলে প্রকৃত কল্যাণ ও শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে না। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী যে এই বাক্য কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারে না ও পারিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার পরিবর্ত্তে তিনি যদি বলিতেন প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম স্বীকার করিলেই এবং ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক আবরণ পরিত্যাগ করিলেই দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বিরোধবিবাদ তিরোহিত হইবে এবং কল্যাণ ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তবেই আমরা তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিতাম। ঢিলটা ছুড়িলে তাহা কোথায় গিয়া পড়িবে বা কাহাকে আঘাত করিবে, সে সকল বিষয় ছুড়িবার পূর্ব্বেই বিচার করা কর্ত্তব্য। উক্ত জননেতার উক্তির মূল্য আছে, ইহা তাঁহার জানা উচিত ছিল; সুতরাং তাঁহার উক্তি দেশের যুবকগণকে সুনীতি বা দুর্নীতির পথে লইয়া যাইবে, তাহা ধীরভাবে অন্তর্দৃষ্টিতে দূরদর্শিতার সহিত বিচার করিয়া দেখা উচিত ছিল। আমরা শতবার বলিব, তাঁহার উক্তির ফলে দেশের অন্তত কতকগুলি যুবকের বিপথে যাইবার সম্ভাবনা উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আমরা দুর্নীতির পথে একটীও দেশবাসীর একটী পদও অগ্রসর হওয়া দেখিতে ইচ্ছা করি না।

সেদিন সংবাদপত্রে দেখিলাম, জনৈক রুষীয় পর্য্যটক লিখিতেছেন যে, রুষের রাজধানীর ও বড় বড় সহরের নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যতীত রাজ্যের অন্যত্র ধর্ম্মের নির্ব্বাসন কথায় মাত্র পর্য্যবসিত—কাজে নয়; তবে সাম্রাজ্যের কালে সাম্প্রদায়িক খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নাগপাশ প্রতিজনের আত্মা ও মনকে যেরূপ পিষিয়া মারিতেছিল, বর্ত্তমানে সেই নাগপাশ অনেক পরিমাণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, এবং রাষিয়ার প্রজাগণ মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম ও স্বাধীনতামূলক মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

মাঝে আরও শোনা গিয়াছিল যে, তুরস্ক হইতেও ধর্ম্ম নির্ব্বাসিত হইয়াছে; কিন্তু পরে জানা গেল যে রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিবেচনা করিলেন যে, ধর্ম্মকে রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত করা মানবের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। তাই তাঁহারা খাঁটি মুসলমান ধর্ম্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রজাগণকে সাম্প্রদায়িকতা রূপাবর্জ্জনায় সমাবৃত ধর্ম্মকে স্বীকার করা হইতে মুক্তিদান করিলেন এবং স্ব স্ব জ্ঞান ও বুদ্ধি মতে যে কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার স্বাধীনতা প্রদান করিলেন।

ধর্ম্মবিষয়ে যেরূপ দেখিলাম, আমাদের দাসমনোভাবের কারণে, রাষিয়ার আরও একটি বিষয়ে দুএকটী কথা শুনিয়া তাহা আমাদের দেশে প্রবর্ত্তন করিবার জন্য এক সম্প্রদায়ের লোক অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া উঠেন; সেটী হইতেছে "সাম্যবাদ"। এই সাম্যবাদের প্রকৃত অর্থ কি? এবং দেশের শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে কি ভাবের সাম্যবাদ কোন্ প্রণালীতে দেশে প্রবর্ত্তিত করা উচিত, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান না। তাঁহারা মনে করেন, সংসারের সর্ব্ববিষয়ক সমস্ত সমুন্নত সৌধগুলি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ধূলিতে পরিণত করাই সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম্ম। আর শতাব্দী পূর্ব্বে ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্সে এই প্রকার অপ্রকৃত সাম্যবাদের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং উহা পরীক্ষায় সম্পূর্ণ অপ্রতিষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আবার সেদিন রাষিয়াবিপ্লবের সময় ঐ অযথা সাম্যবাদের কথা পুনরুদ্দীরিত হইয়াছিল। ইহার ফলে রাষিয়ার কর্ত্তৃপক্ষগণ একটী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এই যে, রাজ্যের ছোট-বড় সকল কর্ম্মচারীকেই এবং সকল শিল্পীকেই সমান বেতন লইতে হইবে। আজ কয়েক বৎসরের পরীক্ষার পর আমরা সংবাদপত্রে দেখি, রাষিয়ার কর্ত্তৃপক্ষগণ স্থির করিতেছেন যে, ছোট-বড়নির্ব্বিশেষে সকলকে একই বেতন দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়—যাহার যে প্রকার কার্য্য তাহাকে সেই প্রকার বেতন দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।

আমাদের দেশের নেতাগণ পাশ্চাত্য দেশের পরীক্ষাসাপেক্ষ মতবাদসমূহের কথায় নাচিয়া না উঠিয়া আমাদের দেশে যুগযুগান্তরের ঘাতপ্রতিঘাতের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে সকল সমাজ ও ধর্ম্মসংক্রান্ত নিয়ম অভিব্যক্ত হইয়া একালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইসকল নিয়ম যদি ভালরূপ আলোচিত হইয়া তাহার দুষ্ট অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাল অংশ দাঁড় করাইবার চেষ্টা করা হয়, তবে আমাদের বিশ্বাস যে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, স্বরাজ সহজেই দেশবাসীর অধিগত হইবে, এবং ভারতভূমি পুরাকালের ন্যায় জ্ঞানোজ্জ্বল কর্ম্মোজ্জ্বল ও ধর্ম্মোজ্জ্বল সুখশ্রীতে পুনরায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

নানাকথা।

ঝান্সীর রাণীর স্মৃতিবার্ষিকী— আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, বিগত ১৯শে জুন তারিখে কাশীধামে ঝান্সীর সুপ্রসিদ্ধ রাণী লক্ষ্মী বাইয়ের স্মৃতিবার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদিন ধরিয়া ভারতে অগ্রগণ্য অনেক পুরুষের স্মৃতিউৎসব সম্পন্ন হইতেছিল, কিন্তু এখন মহিয়সী ভারতরমণীদিগের স্মৃতিউৎসব সম্পন্ন হওয়ায় আমরা দিব্য দৃষ্টিতে অনুভব করিতেছি যে, ভারতবাসী রমণীদিগের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিবার গৌরবপূর্ণ পথে অগ্রসর হইতে শিক্ষা করিয়াছে। আমরা ইহাও দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতেছি যে, ভারতের পূর্ণ জাগরণ অদূরবর্ত্তী। বঙ্গদেশেও রাণী ভবানীর ন্যায় সুপ্রসিদ্ধা রমণীগণের এবং অন্যান্য নীরবকর্ম্মী মহিলাগণেরও স্মৃতিবার্ষিকের অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। এ বিষয়ে কংগ্রেস-নেতাগণ চেষ্টা করিলেই সফলকাম হইতে পারিবেন নিঃসন্দেহ।

জুতাবুরুষের কাজ।—আমরা সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, শ্রীযুক্ত অমলেন্দু গোস্বামী নামক একটী বালক জুতা বুরুষের কাজ হাতে লইয়াছে। দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। আমরা দেখিতেছি, আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের উপদেশ যুবকদিগের প্রাণে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় জাতিগত ব্যর্থ অন্তঃসারশূন্য সম্মানজ্ঞানের উপরে বসিয়া থাকিবার পরিবর্ত্তে জীবনরক্ষার প্রকৃত সদুপায়সকল অবলম্বন না করিলে দেশের পরিত্রাণের সম্ভাবনা কোথায়? মনে হয়, বর্ত্তমান যুগের ন্যায় মহাভারতের সময়েও জীবন-মরণের প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ জাতিগত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সহিত গুণকর্ম্ম-বিভাগজনিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়া জীবনরক্ষার উপায়স্বরূপে নিজ নিজ প্রয়োজনমত কর্ম্ম অবলম্বনে মানুষকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। আমাদের স্মরণ হয়, জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজনমত কর্ম্ম অবলম্বন বিষয়ে স্বাধীনতাপ্রদর্শনে এযুগে ব্রাহ্মসমাজ অগ্রণী হইয়াছিলেন—ব্রাহ্মসমাজেরই কয়েকটী যুবক শতবিধ উপহাস-পরিহাসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া জুতার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। একবার আমার নিকট তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি চাকরীর প্রার্থনা করায় আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, চাকরী করিয়া তাঁহার মত শিক্ষিত ব্যক্তির পরিবার-পোষণের উপযুক্ত বেতন পাওয়া অসম্ভব এবং আমার নিজের ব্যয়ে তাঁহাকে একটী কয়লার দোকান খুলিয়া দিতে স্বীকৃত হইলাম। কিন্তু ঐ যে স্বহস্তে দাঁড়িপাল্লা ধরিয়া কয়লা ওজন করিয়া খদ্দেরকে দিতে হইবে, এই মিথ্যা সম্মানের অভাববোধের কারণে তিনি আমার দানগ্রহণে অস্বীকার করিলেন। হায়! তিনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ করিয়া নিতান্ত অল্প বেতনে পাঠশালার পণ্ডিতি গ্রহণ করিয়া জীবননিষ্পেষক দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে জীবন যাপন করিতে করিতে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তথাকথিত শিক্ষার ফলে বৃথা আত্মসম্মানজ্ঞানে ফুলিয়া উঠিয়া জীবনরক্ষার উপায় পরিত্যাগ করিলে ঈশপ-কথিত ভেকের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। আমরা শ্রীমান অমলেন্দুকে কর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতাপ্রদর্শনে অন্যতর পথপ্রদর্শক ও অগ্রণী বলিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দন করিতেছি। ইঁহার নাম দেশের স্বাধীন-ব্যবসায়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় রাখা উচিত।

জুতা নির্ম্মাণের ব্যবসায়।—১১০নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে কলিকাতা টেক্‌নিক্যাল স্কুল সংলগ্ন ভূমিতে বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউট অবস্থিত। তথায় চামড়া পরিষ্কার করা শিক্ষা দেওয়া হয়। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগ এই স্কুল পরিচালনা করেন। মিঃ বি, এম, দাস ইহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

মিঃ দাসের চেষ্টায় উক্ত স্কুলে সম্প্রতি বুট ও অন্যান্য জুতা তৈয়ারী বিভাগ খোলা হইয়াছে। সেখানে নানা প্রকারের জুতা, সুটকেস, এটাচি কেস প্রভৃতি নির্ম্মাণ-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। মিঃ দাস একজন উৎসাহী ব্যক্তি। তাঁহার চেষ্টায় উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালীর কু-সংস্কার দূর হইয়াছে। ভদ্রলোকের ছেলে চামড়া পরিষ্কার ও জুতা নির্ম্মাণ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেকার-সমস্যা প্রবল হইয়াছে। এসময়ে জুতা নির্ম্মাণ দ্বারা কম পক্ষে ২৫০০০ হইতে ৩০০০০ লোকের কাজের সংস্থান হইতে পারে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এই কলিকাতা সহরে প্রতি বৎসর ৩৷ লক্ষ জোড়া জুতা তৈয়ারী হয়। ইহার দাম ১৪ লক্ষ টাকার কম নহে। তারপর বিদেশ হইতেও জুতা, সুটকেস, এটাচি কেস প্রভৃতি যথেষ্ট আমদানী হয়। কলিকাতা ও বাঙ্গালার অন্যান্য সহরে অতি সহজেই এই সমস্ত চামড়ার দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে।

মিঃ দাসের স্কুলে উত্তমরূপে জুতা নির্ম্মাণ শিক্ষা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই বহু ছাত্র তথায় প্রবেশ করিয়াছে। শিক্ষা শেষ করিয়া যাহারা বাহির হইবে, তাহারা অনায়াসেই স্বাধীনভাবে জুতা, সুটকেস, এটাচিকেস, ক্যাসব্যাগ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারিবে। কুটীরশিল্প হিসাবে জুতানির্ম্মাণ চলিতে পারে। ইহাতে খুব বেশী মূলধনের প্রয়োজন নাই। কয়েক শত টাকাই যথেষ্ট। একটা সেলাই করিবার কল কিনিলেই হাতে জুতা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বাঙ্গলার শিক্ষিত বেকার যুবকগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সঞ্জীবনী—১১ আষাঢ়, ১৩৩৮।

———

ADDITIONS AND CORRECTION TO THE CURRENT HISTORY OF THE BRAHMO SAMAJ.

(DR. V. RAI.)

(2) A Correction.

Rammohon Roy died on the 27th Septembar 1833. On October .5 his secretary Sandford Arnot published in the Atheneum a short sketch of his life purporting to have been written by himself. Miss Mary Carpenter considered it to be genuine and printed it in 1866 in her book "Last days in England of Raja Rammohon Roy."

Miss Collet in her "Life and Letters of the Raja" published in 1900 calls the Sketch to be spurious. We have to examine whose view is correct. Miss Collet's continuator records the following verdict as to Arnot's character : –

"Unless this quondam journalist (Arnot) has been shamefully traduced, he was a low, cunning parasite. Having fastened on a rich and generous patron, whose position in a strange land made him peculiarly dependent on the guidance of British friends, he turned the opportunity without scruple to his own sordid account. In this as in other instances Rammohon showed himself—probably through an excess of good nature—lacking in wise choice of friends."

The autobiographical sketch is very brief. It contained only eighteen statements and three reasons for the last statement. Statements No. 4 and 5 are as follows :—

"When about the age of 16, I composed a manuscript calling in question the validity of the idolatrous system of the Hindus. This, together with my known sentiments on that subject, having produced a coolness between me and my immediate kindred, I proceeded on my travels, and passed through different countries, chiefly within, and some beyond, the bounds of Hindusthan." This statement about leaving home about the age of 16 and because of a coolness between Rammohon and his kindred is demonstrably false.

Dr. Lant Carpenter states "Without disputing the athority of his father, he (Rammohon) often sought from him informations as to the reasons of his faith ; he obtained no satisfaction and he at last determind at the early age of 15 to leave the paternal home, and sojourn for a time in Thibet, that he might see another form of religious faith."

Dr. Carpenter adds in a footnote :— "The statement made in the preceding sentence, I heard from the Raja himself in London, and in Stapleton Grove."

So that Rammohon left home at the age of 15 and not at the age of 16 and the reason was to see anthor form of religious faith and not a coolness between him and his immediate kindred.

Statement No. 13 of the sketch is "I was at last deserted by every person except two or three Scotch friends to whom and the nation to which they belong, I always feel grateful." In Rammohon's letter to Mr. Digby in 1817 Rammohon Roy says—"I however, in the beginning of my pursuits, met with the greatest opposition from their self-interested leaders, the Brahmins, and was deserted by nearest relations ; I consequently felt extremely melancholy ; in that critical situation, the only comfort that I had was the consoling and rational conversation of my European friends, especially those of Scotland and England." One can hardly imagin why Rammohon should in his brief sketch exclude all others besides the Scotch.

Statement No. 16 of the brief sketch is "I now felt a strong wish to visit Europe."

The 'now' would indicate shorty or at any rate only a few years before the time when he sailed (in 1830). But we find that in his letter to Mr. Digby of 1817 Rammohon Roy said "You may depend upon my setting off for England within a short period of time and if you do not return to India before October next you will most probably receive a letter from me informing you of the exact time of my departure for England, and of the name of the vessel on which I shall embark." The statement in the brief sketch and the statement in

the letter to Mr. Digby can not in any way be reconciled.

Lastly, Miss Carpenter considers that the autobiographical sketch was writtin to Mr. Gordon of Calcutta, just before he went to France. But we find that in September 1821, when the Calcutta unitarian committee was originated, Mr. Gordon was one of that committee. Therefore being acquainted with Rammohon from 1821 onwards he had no need of being told the eighteen things that make up the whole of the brief sketch. So we have no hesitation to call the brief autobiography to be an altogether spurious affair.

It is necessary to come to a decision about the genuineness or spuriousness of this autobiographical Sketch, becouse if it is spurious no statement contained in it should be relied on, unless supported by other independent reliable testimony.

Such statements are No. 5 "when about the age of 16 I composed a manuscript colling in question the validity of the idolatrous system of the Hindus" and part of the statement No. 6 "I proceeded on my travel • • • with a feeling of great aversion to the establishment of the British power in India."

গ্রন্থপরিচয়।

AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE BHAGABAT-GITA—মূল্য ১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র ন্যায়বাগীশ বি-এ ইং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফয়জাবাদ সাহিত্যসভায় গীতাসম্বন্ধে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ ইংরাজীতে পাঠ করেন, তাহা ১২৪ পৃষ্ঠায় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে গীতা অন্যতম, অপর দুইটি প্রস্থান হইতেছে উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্র। প্রকৃত-পক্ষে এই তিন প্রস্থানের সম্যক্ অধ্যয়ন ও আলোচনা ভিন্ন প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান অন্তরে সঞ্জাত হয় না। ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের যে গবেষণা আছে, এই পুস্তিকাতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় মিলে। আমরা অবতারবাদের পক্ষপাতী নহি। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ একেবারে ভগবানে নিমগ্ন হইয়া যোগযুক্ত অবস্থায় গীতার শ্লোকগুলি অর্জ্জুনকে বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, আমি যোগযুক্ত হইয়া যাহা একবার বলিয়াছি, তাহার আর পুনরুল্লেখ করিতে সমর্থ হইব না "ন চ শাক্য পুনর্ভূয় স্মৃতি মে সংভবিষ্যতি"। পুস্তিকখানি সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা নানা তথ্যে পরিপূর্ণ। ইহাতে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এই পুস্তিকায় খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে যে সমস্ত অমূল্য উক্তি আছে, তাহারও কয়েকটির উল্লেখ করিয়াছেন মুসলমান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইস্‌লাম-শব্দের অর্থ ভগবানে আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন। এই আত্মসমর্পণ ভক্তি ভিন্ন অসম্ভব। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম যখন একটি ধর্ম্ম, তখন উহা ঈশ্বরবিহীন হইতে পারে না। বৌদ্ধ দর্শন; যাহা পরে সংরচিত হইয়াছিল, তাহা বুদ্ধদেবের প্রকৃত শিক্ষার ঠিক অনুগত নহে। আমরা এই পুস্তিকাপাঠে আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ ঠিক ভগবান কি না বা পূর্ণ অবতার কি না, সে দিকে জোর না দিয়া গীতার অন্তর্নিহিত নির্ব্বিবাদ খাঁটি সত্য আহরণ করিতে হইবে—"সর্ব্বেভ্যঃ সারম্ আদদ্যাৎ পুষ্পেভ্যঃ ইব ষট্‌পদঃ"। মধুকর যেমন পুষ্প হইতে সারভাগ গ্রহণ করে, আমাদিগকেও সর্ব্বশাস্ত্র হইতে তেমনি সারসংগ্রহ করিতে হইবে।

AN EPISTLE TO THE PRINCES OF INDIA By Rai Jadu Nath Majumder Bahadur C,I,E,

যশোহরের যদুনাথ মজুমদার মহাশয় বঙ্গের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ উকীল। কিন্তু কেবলমাত্র ওকালতী তাঁহার অপরিসীম কার্য্য-কুশলতাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি শাস্ত্রদর্শী এবং একখানি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রের (হিন্দুপত্রিকার) সম্পাদক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নিজের বিশাল ব্যবসা আছে। সকল ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ভারতীয় রাজগণ উদ্দেশে তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ সুপরামর্শগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত নামে প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরলোকগত (নেপালের) সামসের জং বাহাদুর মহোদয়ের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। উক্ত পুস্তিকায় রাজগণের কল্যাণ-কামনায় যে সমস্ত উপদেশ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই হিতকর ও বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উপ-যোগী। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে কয়েকটির অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"যে পিতা পুত্রগণের কল্যাণ চান, তিনি নিজে অপবিত্র জীবন যাপন করিতে পারেন না; কেননা

সন্তানগণ প্রায়শঃ পিতার অনুসরণ করে। রাজা কি প্রজাগণের পিতা নন?"

"দেহ মন বাক্যকে পবিত্র রাখ। তুমি যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হও না কেন, তোমার অন্তরে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব নিপতিত হইবে।"

"প্রজাপ্রদত্ত কর রাজার বিলাসবিভ্রমের জন্য নহে, কিন্তু উহা প্রজার কল্যাণবর্দ্ধনের জন্য।"

"দক্ষ ও সাধু লোককে মন্ত্রণাকার্য্যে নিয়োগ কর। চাটুকারকে প্রশ্রয় দান করিও না।"

THE EVIDENCES OF THISM—শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত। মূল্য ।৹ আনা।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে চতুর্ব্বিধ প্রমাণের উল্লেখ আছে। সীতানাথ বাবু একজন দার্শনিক। পুস্তকখানি সংক্ষিপ্ত হইলেও তিনি ইহাতে তাঁহার সমধিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকখানি সাধারণের পক্ষে সুবোধ্য না হইলেও তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে ইহা যথেষ্ট মূল্যবান। ইহা বঙ্গভাষায় অনূদিত হইলে আরও কল্যাণের সম্ভাবনা। বর্ত্তমান সময়ে ঈদৃশ পুস্তকের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি। চি. চ।

বাঙ্গালীর খাদ্য।—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী ভিষগ্‌রত্ন এল, এ, এম, এস প্রণীত। "আরোগ্য নিকেতন" ২০নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য ॥৹ আনা। 'ডবল ক্রাউন' আকারে ১০৫ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ।

উদীয়মান কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন মহাশয় ইতিমধ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিকপত্র-পরিচালনায়, প্রবন্ধরচনায় ও গ্রন্থপ্রণয়নে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ ইহাঁর এই "বাঙ্গালীর খাদ্য" যে জনসাধারণের প্রিয় হইয়াছে, তাহা ইহার তৃতীয় সংস্করণ হইতেই সুব্যক্ত। পনেরোটী পরিচ্ছেদে নানাদিক দিয়া নানা ভাবে বাঙ্গালীর খাদ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যতত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্যে আয়ুর্ব্বেদের মত কি, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু প্রভৃতি খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও দেশীয় আচার-ব্যবহার ও আয়ুর্ব্বেদীয় মতের সমাবেশে ইহার অভিনবত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত, গ্রন্থখানির প্রাঞ্জল ভাষা ও অনাড়ম্বর ভঙ্গি ইহাকে বালক ও স্ত্রীলোকদিগেরও প্রিয় করিয়া তুলিবে। পরিশেষে বক্তব্য 'ভাইটামিন' পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার। ভারতীয় প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে এই নবাগতটীর কোন পরিচয় পাওয়া যায় কি না, সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার কিছু আলোচনা করিলে সুখী হইতাম।

পথের কথা ও নীতিগাথা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রিডার প্রণীত, ডবল ক্রাউন আকারে ।/৹+২৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৷৷৹ আনা।

গ্রন্থকার দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যে সব সুচিন্তা ও সত্য চিন্তা করিয়াছিলেন, সংক্ষিপ্ত গদ্যে ও পদ্যে তাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; এইগ্রন্থে সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, এই গ্রন্থে ইংরাজি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় "সুভাষিতগুলি" তাঁহার "স্মারকলিপি" হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে গ্রন্থকারের উদার হৃদয়, উন্নত মস্তিষ্ক ও শোভন রুচির পরিচয়ে আনন্দ দান করে।

আর্য্যপ্রতিভা।—শ্রীসূর্য্যকুমার দে বি-এ অধ্যাপক, আকিয়াব। রয়াল ১৬ পেজী আকারে ৭১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ।/৹ আনা।

এদেশে ইউরোপীয় জাতির সমাগমের পূর্ব্বে নানা-বিষয়ে আর্য্যজাতির প্রতিভার যেরূপ বিকাশ ঘটিয়াছিল, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখক সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে প্রাচীন ভারতের শিল্প, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে বহু গবেষণা করিতে হইয়াছে। লেখকের অনুসন্ধিৎসা ও আলোচনার সহিত পরিচিত হইয়া আমরা উপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছি। সু. চ. চৌ.।

যোগেন্দ্রস্মৃতি—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় চক্রবর্ত্তী প্রণীত "শোকোচ্ছ্বাস" এবং শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল কুণ্ডু মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "যোগেন্দ্রস্মৃতি" নামক দুইখানি পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তিকা দুইখানিতে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত হরিপুরের জমীদার স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সৎকার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে এবং তাঁহার বিভিন্ন বয়সের দুইখানি হাফটোন প্রতিকৃতি আছে। সদাশয় যোগেন্দ্র বাবুর সাধু দৃষ্টান্ত সকলেরই অনুকরণীয়।

সুদিন বিচার।—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সঙ্কলিত। কাশীধাম মহামণ্ডল প্রেসে শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৵৹ আনা।

বিদুষী মহিলা শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রণীত সুদিন-বিচার পড়িয়া সুখী হইলাম। ইহা দিন দেখিবার অত উপাদেয় গ্রন্থ। জ্যোতিষ হইতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়া অতি সরলভাবে সাধারণের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান নাস্তিক্য-

থাদের যুগে অনেকেই অনেক কিছু মানিতে না চাহি-লেও জ্যোতিষ যে আমাদের প্রাচীন উন্নত যুগের ঋষিগণের একটী শ্রেষ্ঠ অবদান, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। হিন্দুদের প্রতি পদক্ষেপে জ্যোতিষের প্রয়োজন থাকা সত্বেও সম্যক আলোচনার অভাবে আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারের এই অমূল্যরত্নটী জ্যোতিহীন হইয়া পড়িতেছে। শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জ্যোতিষে আগ্রহ দেখিয়া আশা হয় যে, আবার অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এবিষয়ে মনোযোগী হইয়া জ্যোতিষের অন্তর্নিগূঢ় তত্বপ্রকাশে সক্ষম হইবেন। উপযুক্ত শিক্ষা ও গবেষণা হইলে আবার জ্যোতিষের পূর্ব্বগৌরব ফিরিয়া আসিতে পারে। জ্যা. ব.।

শোকসংবাদ।

মহামহোপাধ্যায় ৺যোগীন্দ্রনাথ সেন বৈদ্যরত্ন।—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, গত ১৬ই আষাঢ় বুধবার বেলা ৯ ঘটিকার সময় বৈদ্যরত্ন কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার ৬২ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। ইনি স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং নিজেও সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। ইঁহার পিতার উপদেশক্রমে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় বিশেষ কৃতিত্বলাভের উদ্দেশ্যে ইনি মেডিকেল কলেজেও তিন বৎসর পাঠ করিয়াছিলেন। কলেজ ছাড়িয়া তাঁহার পিতার নিকটও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। ইনি আয়ুর্ব্বেদসম্মিলনের প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতৃদেবের অধ্যাপক কবিরাজ-কুলতিলক গঙ্গাধর চরকসংহিতার "জল্পকল্পতরু" নামে টীকা প্রণয়ন করেন। কিন্তু সেই টীকা সাংখ্য-বেদান্তাদি ষড়্দর্শনের তত্বে পূর্ণ থাকায় সাধারণ ছাত্রের তাহা বোধগম্য হয় নাই। সেই দার্শনিকতা-সম্বলিত চরকসংহিতা এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। সাধারণের বোধগম্য একখানি প্রাঞ্জল টীকা প্রণয়ন করিয়া চরকের এক অভিনব সংস্করণে ইনি হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি উহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। আমরা পরলোকগত আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে শান্তিসান্ত্বনা প্রদান করুন।

আদিব্রাহ্মসমাজের

আয় ও ব্যয়।

১৮৫১ শক। ১৩৩৬ সাল।

নেট আয়		৪২৭৮৷৶০
জমাখরচী		১০৫৫৷৴৯
মোট আয়		৫৩৩৪৲৯
পূর্ব্ববৎসরের স্থিতি		২৬৮৶০
সমষ্টি		৫৩৬০৸৶৯
নেট ব্যয়	৪৬৫৮৵৬	
জমাখরচী	৫৩৩৸৵০	
মোট ব্যয়		৫১৯২৲৬
স্থিত		১৬৮৸৶৩

আয়

ব্রাহ্মসমাজ।

মাসিক দান	২৪০০৲
আনুষ্ঠানিক দান	৬৮৲
এককালীন দান	২৫৲
উৎসবের দান	৫৲
বণ্ডেড অয়ার হাউস:	১০০৲
দানাধারে প্রাপ্ত	৬৸৶৩
প্রচার ফণ্ড	৭৯৶০
সমষ্টি	২৬৮৪৲৩

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	১৩৫৷০
হাল	১৪৭৸৶০
অগ্রিম	১৲
নগদ	১৫৷০
বিজ্ঞাপন	২৭৭৷০
মাশুল	২১৵০
সমষ্টি	৫৯৮৷৴০

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তক মুদ্রাঙ্কন	৬৫৫৸৯
কাগজের মূল্য	৩০০৷৴০
দপ্তরী	৪০৲
সমষ্টি	৯৯৬৴৯
সর্ব্বসমষ্টি	৪২৭৮৷৶০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্যের পাথেয়	১২০৲
গায়ক	৩৮৫৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫০৲

হিঃ রক্ষক	১১০৲
বেহারা	১৩২৲
মেথর	২৭৲
পাখাকুলি	৬০/০
মাশুল	৩৭৮৵৩
ইলেকট্রিক	৫৬।৬
আলো মেরামত	৮।/০
কেরোসিন	৭।৵৬
বারবরদারী	৬৩৲
অন্যান্য	৪১৲৬
সরঞ্জামী	১৩।০
ট্যাক্স	২৭০৸০
ড্রেণ পরিষ্কার	৫৹/০
পূর্ত্তকার্য্য	২৭॥৶৬
মেডিকেল মিশন	১৮৸৶৬
প্রচার ফণ্ড	৪৬॥/০
খাজনা	২॥৬
পার্ব্বণী	২১০
মাঘোৎসব	২৯৯।৯
চৈত্র-সংক্রান্তি	৬।/৬
হাওলাত প্রদান	৩৲
সস্‌পেন্স	৸৶০
কাগজ ক্রয়	২১১৸৵৩
গচ্ছিত	২৯৬.৯
সমষ্টি	২২৫২।৬

তত্ত্ববোধিনী।

কাগজের মূল্য	১৭৭।০
দপ্তরী	৪৮।৶৬
মাশুল	৭৩/৬
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫০৲
হিঃ রক্ষক	১০০৲
মূল্য আদায়ের কমিশন	২৪৮/৬
বিজ্ঞাপন	১৬৲
বিবিধ	১৮০
সমষ্টি	৫৩১৶৯

যন্ত্রালয়।

প্রিণ্টার	২৯৩৸৶০
কম্পোজিটর	৪৭৪৮৵৩
প্রেসম্যান	২৩৪৬
ইঙ্কম্যান	১১১৶৩
কাগজতোলা	৬৭।/০
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫০৲
হিঃ রক্ষক	১০০৲
প্রুফ কাগজ	৭।৶০
ছাপার কাগজ	২৫৫।৬
কালি	১৫।৬
তৈল	৬৸/০

তামাক	৪।৶৬
সাজিমাটি	৩৲৬
ফুলচালা	৩॥৶৬
মাশুল	।৶০
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	১২২৵৯
সেই জন্য ময়দা	১৮/৩
দপ্তরী	৪৭৶০
বিবিধ	৩২॥/৬
জলপানী	৭৸০
শিরিষ	৩।৬
ব্রাস	১॥/৬
দড়ি	৸৬
পিতলের কল	২॥০
অক্ষর ক্রয়	১৪।৶০
লাইসেন্স	১২৲
সমষ্টি	১৮৭৪॥৶৩
সর্ব্বসমষ্টি	৪৬৫৮৵৬

জমাখরচী।*

ব্রাহ্মসমাজ	আয়	ব্যয়
কোম্পানীর কাগজ বিক্রয়	২৮২॥৶৯	০
ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন	২৩৯৲	০
উৎসবের বক্তৃতা মুদ্রণ		৪৮৲
ঐ কাগজের মূল্য		২৭॥০
ঐ দপ্তরী		৩৮।৶০
	৫২১॥৶৯	১১৩৸৶০
যন্ত্রালয়		০
উৎসবের বক্তৃতা	৪৮৲	০
দপ্তরী	৩৮।৶০	০
কাগজের মূল্য	২৭॥০	০
তত্ত্ববোধিনী মুদ্রণ	৪২০৲	০
	৫৩৩৸৶০	
তত্ত্ববোধিনী মুদ্রাঙ্কন	০	৪২০৲
সমষ্টি	১০৫৫॥/৯	৫৩৩৸৶০

	আয়	ব্যয়
ব্রাহ্মসমাজ	৩২০৫৸০	২৩৬৬৸৶০+৮৩৯॥/৬
তত্ত্ববোধিনী	৫৯৮/০	৯৫১৶৯ −৩৫২৸৵৯
যন্ত্রালয়	১৫২৯৸৶৯	১৮৭৪॥৩ −৩৪৪॥৵৬
সমষ্টি	৫৩৩৪৲৯	৫১৯২৲৬=+৮৩৯॥/৬−৬৯৭॥/৩=+১৪২৲৩+২৬৸৶+১৮৮৸৵৩

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

* জমাখরচী টাকা মাত্র পাল্টাই জমাখরচ প্রকৃত আয় ও ব্যয় নহে।

ওঁ তৎসৎ

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩১। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২।

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৭৮। দূরে থেকো না।

মা! আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়া থাকিও না। আমাকে পাগল করিও না। তোমার নিশ্বাসের সুবাস যখন আমি কল্পনাতেও অনুভব করি, তখন আমি তো আর আমাতে থাকি না। যখন তোমার স্নেহের ডাক প্রাণের ভিতর প্রতি-ধ্বনি জাগাইয়া তোলে, তখন মা মা বলিয়া তোমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য প্রাণ যে একেবারে উতলা হইয়া ওঠে। প্রভাতে যখন দেখি, কনক-ভানু আস্তে আস্তে আকাশ ঠেলিয়া উঠিতেছে, তখন তো আর থাকিতে পারি না; তাহার মধ্যে কি জানি কেন তোমারই মুখ দেখিতে পাই, আর তাই ইচ্ছা হয় সমস্ত সূর্য্যখানিকে প্রাণের সঙ্গে আলিঙ্গন করি। পৌর্ণমাসী সন্ধ্যায় যখন দেখি, পূর্ণচন্দ্র আকাশের মাঝখান দিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে, তাহা হইতে তো চক্ষু আর ফিরাইতে পারি না—দেখিতে দেখিতে সমস্ত চাঁদ ব্যাপ্ত করিয়া তোমারই স্নেহে ভরা প্রসন্ন মুখ ভাসিয়া ওঠে। যতই দেখি কিছুতেই আর তৃপ্তি হয় না। শেষে যখন প্রভা-তের মুখে চন্দ্রমা পশ্চিমে ঢলিয়া পড়ে, আর অদৃশ্য হইয়া যায়, আমি তাহা জানিতেও পারি না—তোমারই মুখ অনুক্ষণ আমার নয়নের সম্মুখে জাগ্রত থাকে—আমি আপনাকে তোমারই বক্ষে কখন যে হারাইয়া ফেলি, বুঝিতেও পারি না। কখন যে তুমি লুকাইয়া আসিয়া আমার চক্ষে ঘুমের ঘোর বুলাইয়া দাও, কিছুই জানিতেও পারি না। আমার প্রতি তোমার স্নেহ যখন তোমাকে বড়ই পীড়া দেয়, তখনই তুমি ছুটিয়া আসিয়া স্নেহপ্রেমের ধারায় আমায় ডুবাইয়া দাও। সংসারের বিপদআপদের ঝঞ্ঝাবাত যখন আমার মাথার উপর দিয়া প্রচণ্ড বেগে বহিতে থাকে, তখন তুমি যে কি আশ্চর্য্য উপায়ে আমাকে তোমার পক্ষপুটের নিম্নে রাখিয়া রক্ষা কর, তাহা কাহাকে বলিব? আমি নিজেই তো তাহা বুঝি না। মা! তুমি মাঝে মাঝে লুকাইয়া থাক, আমার কাছে ধরা দাও না বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমি সারা হইয়া গিয়াছি—আমার সমস্ত বল ও শক্তি অশ্রুধারার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। এখন তুমি আসিয়া আমার প্রার্থনাগুলি সফল করিয়া অন্তরে বল ও শক্তি বিধান কর—আমাকে নূতন মানুষ করিয়া গড়িয়া তোল। তোমার নাম-গানে আমাকে পাগল করিয়া তোল, যাহাতে

আমি মাতৃনাম শুনাইয়া জগতবাসীর প্রত্যেককে আমারই মত পাগল করিয়া তুলিতে পারি।

৭৯। আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি।

মা! আমার হৃদয় যে অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে। ঐ আঁধার ঘরে তোমার প্রদীপখানি জ্বালাইয়া রাখ। আমার হৃদয়ে কোথায় কি যে আছে, কিছুই যেন খুঁজিয়া পাই না। তোমার গর্ভে যখন শুইয়াছিলাম, তখন তো সেখানে এতটুকু আলোক প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু সেখানেও তোমার স্নেহদৃষ্টি শত চন্দ্রসূর্য্যের জ্যোতিতে অন্ধকার বিখণ্ডিত করিয়া আমার অন্নপানের যোগাড় করিয়া দিত। আমার বড় ইচ্ছা হয়, এই সমস্ত সংসারের ঝড়ঝাপটা এড়াইয়া গিয়া আবার সেই আগেকার মত তোমার গর্ভের নীরব শান্তির মধ্যে লুকাইয়া পড়ি। চক্ষু চাহিলেই আমি ভয়ে কাঁপিতে থাকি, কখন্ কি ঝড়ঝাপটা আসিয়া আমাকে ধরাশায়ী করে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলেই যেন আমি ভাল থাকি—অন্তরে সমস্ত ক্ষণই তোমারই প্রসন্ন মুখখানি জাগিয়া থাকে। অন্ধকারের ভিতর তোমারই হাতে প্রজ্বলিত দীপখানি জ্বলিতে থাকে। তখন দেখি, অন্ধকার বলিয়া যে ভয় পাইতেছিলাম, সে ভয়ের কোন কারণ নাই—তোমারই জ্যোতিতে তো সমস্ত আলোকিত হইয়া আছে। "আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি, দিবারাতি নাই সেখানে"। আশ্চর্য্য এই যে, ইহা আগে আমার চোখে পড়ে নাই। এসো মা! আমার আঁধার ঘরে এসো। কি জানি কেন, আমার প্রাণের ভিতর মাঝে মাঝে ঘন অন্ধকার ছাইয়া ফেলে। আমি জানি, আমি দেখিয়াছি, সেখানে তোমার জ্যোতি দিনরাত প্রকাশ পাইতেছে, তবু কি জানি কেন, অন্ধকারের একটা ঘোর আসিয়া মাঝে মাঝে আমাকে মুহ্যমান করিয়া ফেলে। তোমাকে কাতর প্রাণে ডাকিতেছি। তুমি আসিয়া আমার প্রাণের এই অন্ধকার কাটাইয়া দাও। তোমার এই শিশুসন্তানকে কোলে তুলিয়া লও। আমার এই অশান্ত প্রাণ একটু শান্ত হোক। অশান্তির বোঝা বহিবার আর শক্তি নাই। মা! কোলে তুলিয়া লও।

৮০। কোলে লও।

মা! না হয় আমি তোমার নিকট বড়ই অপরাধ করিয়াছি, তাই বলিয়া কি আমাকে মাটীতে এই রকম জোরে ছুড়িয়া ফেলিতে হয়—আমার প্রাণে কি ব্যথা লাগে না? তোমার কাছে আমার কান্না ছাড়া আর তো কোনই বল নাই। যদি কোন দোষ করিয়া থাকি, শতবার তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু আমি যখন তোমার সন্তান, তখন এ প্রকারে আমাকে দূরে সরাইয়া রাখিতে পার না। আমাকে যতই দূরে ঠেলিয়া ফেলিবে, আমি ততই জোরে তোমার কোলে উঠিবার জন্য তোমার চরণতলে আসিয়া দাঁড়াইব। এই রকম মাঝে মাঝে আমার দোষের জন্য আমাকে তোমার কোল হইতে নামাইয়া দাও বলিয়া লোকে মনে করে যে তুমি আমাকে ভালবাস না। কিন্তু মা আমি জানি, তুমি আমাকে কত ভালবাস। তুমি আমাকে কোলে তুলিয়া না লইলে আমার নিদ্রা বিশ্রাম কিছুই থাকিবে না; আমি দিনরাত তোমার ঐ মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিব—আমার গান কথা, এমন কি কান্নাও থামিয়া যাইবে, তখন তো আর আমাকে কোলে না লইয়া থাকিতে পারিবে না। আমি এই তোমার চরণ ধরিয়া পড়িয়া রহিলাম। তোমার চরণ ছাড়া সংসারের আর যাহা কিছু, আমার কাছে সকলই শূন্য—সকলই শূন্য। আমার সমস্ত হৃদয় শূন্য হইয়া গিয়াছে। তুমি আমায় তোমার কোলে লইয়া আমার হৃদয়কে তোমার স্নেহপ্রেমে পূর্ণ করিয়া দাও—আমি একটুখানি প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়া শান্তি লাভ করি।

৮১। সংসার-শৃঙ্খল।

মা! সংসারের কাজে ডুবিয়া আছি। তুমি কতই ডাকিতেছ। আমিও তোমার ডাকের সাড়া দিয়া বারে বারে বলিতেছি—যাই—যাই। কিন্তু সংসারের কাজও আর সারা হয় না, তোমার কাছেও আর যাওয়া হয় না। তুমি তোমার স্নেহপ্রেমের স্তন্যদানে আমার অন্তর ভরিয়া দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া আছ। আমি যাইতে পারিতেছি না বলিয়া তোমার স্নেহপ্রেম পাইবারও অধিকার পূর্ণভাবে পাইতেছি না। সংসার হইতে

তুমি আমাকে ছিনাইয়া লইয়া যাও। কাজ করিতে করিতে সংসারের কাছে কতই আঘাত পাইতেছি। কিন্তু এ কোথায় আমাকে ফেলিয়াছ যে, এত আঘাত পাইয়াও এত কষ্টের ভিতর প্রাণের সহস্র ইচ্ছা সত্ত্বেও তোমার কোলে উঠিবার অবসরই পাই না। সংসারে প্রবেশের পূর্ব্বে নদীর ঢেউয়ে ভাসিতে ভাসিতে তোমার নামে কত গান রচনা করিতাম, তোমাকে সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া ফুলের সঙ্গে বাতাসের সঙ্গে কত না খেলা করিতাম, কত না প্রাণের হাসি হাসিতাম। তুমি যে ঝকঝকে নীল বসন পরিয়া আমার কাছে হাসিতে, আমি সেই বসন ধরিয়া তোমার কোলে উঠিবার কত না চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এ কি কাজের ভার আমার উপর দিয়াছ যে, আমাকে সে খেলা, প্রাণের সেই খোলা হাসি, সমস্তই ভুলিতে হইয়াছে। সময়ে সময়ে আশঙ্কা হয়, তোমাকেই বা ভুলিয়া বৃথা কাজেই সময় কাটাইয়া দিই। মা—মা রক্ষা কর সে পাপ হইতে। আমি আর কাহারও কথা শুনিব না—সংসার হইতে আমি সরিবই সরিব—দিনরাত তোমার ঐ চরণতল ধরিয়া আমার জীবনের একতারাতে তোমারই নাম গাহিতে থাকিব। তুমি এসো—তোমার পদধ্বনি শুনিলেই আমার সংসারশৃঙ্খল স্বতই খসিয়া যাইবে। তখন চন্দ্রতারা সকলই আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে। তুমিও আনন্দের স্নিগ্ধ হাসি হাসিবে। তোমার সেই প্রসন্ন মুখ দেখিয়া আমি বিভোর হইয়া যাইব।

৮২। নির্জ্জনে।

মা! আমি নির্জ্জনে তোমার সঙ্গে দুটো কথা কহিতে চাই। চারিদিকে যখন লোকজন আত্মীয় স্বজন তোমাকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকে, আমি সেখানে চুপ করিয়া এক কোণে বসিয়া থাকি। সেখানে আমার কথা ফুটি ফুটি করিয়াও ফোটে না। তবে যদি তুমি নিজে নিকটে আসিয়া স্নেহে ও প্রেমে ডাক দিয়া আমার সেই মুকত্ব ঘুচাইয়া দাও, তখন আমার প্রাণের কথা নীরবে অশ্রুর আকারে প্রকাশিত হইয়া তোমার চরণে পতিত হয়। তখন তুমি আমার প্রাণের ব্যথা বুঝিয়া আমাকে কোলে তুলিয়া লও—সে আনন্দ তুমি ছাড়া আর কে বুঝিবে? নিশীথের ঘন অন্ধকার যখন চারিদিক ঘিরিয়া ফেলে, যখন সকলেই তোমাকে ছাড়িয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে তোমা হইতে দূরে যায়, তোমার সঙ্গে আমার কথা কহিবার সেই তো প্রশস্ত সময়। সেই সময় আবোলতাবোল ভাষায় কত বাজে কথা বলিয়া তোমাকে যে বিরক্ত করি, তাহার ঠিকানাই থাকে না; আমি তো তাহার মধ্যে কোনই শৃঙ্খলা খুঁজিয়া পাই না; কেবল বুঝি যে, আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিতেছি, আর আমার প্রাণ হালকা হইতেছে। যখন প্রাণের বাগানে শিউলি-ফুল ঝরিয়া সুগন্ধে আমাকে আকুল করিয়া তোলে, তখন তোমারই চরণে পূজা দিবার জন্য শিউলি ফুলগুলি একে একে তুলিতে তুলিতে তোমার সঙ্গে কত-না প্রাণের কথা কই—সে কি আরাম! চিরকাল যেন আমি এই রকম তোমার আঁচলধরা শিশুই থাকি। অনন্তকাল আমি তোমার আঁচল ধরিয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলিবার ফিরিবার অধিকার পাইলেই সুখী।

অশ্রদ্ধায় বিনাশ, শ্রদ্ধায় জ্ঞানলাভ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। অশ্রদ্ধায় বিনাশ।

ভারতের ঋষিদিগের নিকট হইতে আমরা এই একটী মহান সত্য লাভ করিয়াছি যে, যাহারা ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া সাধু ব্যক্তিদিগকে উপহাস করে এবং ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধাবান লোকেরা যে বিনাশের মুখে পতিত হইবে, তাহাতে কোনই ভুল নাই। এই সত্য একটী মস্ত সত্য—ইহার একটী বর্ণও মিথ্যা নহে, মিথ্যা হইতেই পারে না।

২। ধর্ম্ম কি?

ধর্ম্ম বলিলে আমরা বুঝি, যাহা কিছু জগৎসংসারকে ধরিয়া রাখে। ভাল কর্ম্ম, ভাল ভাব, ভাল চিন্তা প্রভৃতি ভাল যাহা কিছু, তাহাই সংসারকে ধরিয়া রাখে। তবেই দাঁড়াইল এই যে, সংসারকে ধরিয়া রাখিবার উপযোগী যাহা কিছু, তাহাই ভাল, তাহাই ধর্ম্ম—এইটুকু আমরা সোজাসুজি বুঝি। সুতরাং

ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া, ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া ধর্ম্ম হইতে, ভাল বিষয় হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখিলে আমরা কাহার উপর, কোন্ দৃঢ় ভিত্তির উপর আমাদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিব? তাহা হইলে জীবনে দৃঢ় অবলম্বন কোন কিছুই থাকে না। জগতসংসার আমাদিগকে তখন আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। বাঁধিয়া রাখিবার উপযোগী যাহা দৃঢ় মঙ্গল রজ্জু, তাহা যে স্বহস্তে কাটিয়া দিয়াছি।

৩। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুশাসন।

কাজেই ধর্ম্ম হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অধর্ম্মের পথে চলিতে থাকিলে কক্ষভ্রষ্ট ধূমকেতুর ন্যায় বিনাশের মুখে, মৃত্যুর মুখে যে পতিত হইব, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুশাসন এই যে, কখন ধর্ম্ম নাই এরূপ মনে করিবে না এবং ধার্ম্মিকদিগের প্রতি উপহাস করিবে না। যদি কখন ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আপনাকে প্রকৃতিভ্রষ্ট ও বিপদের সন্নিহিত জানিয়া সাবধান হইবে।

৪। অধ্যাত্ম-রাজ্যের নিয়ম।

যেমন জড়রাজ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্মনিয়ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঈশ্বর যেমন প্রকৃতির নিয়ন্তা, সেইরূপ তিনি অধ্যাত্ম-রাজ্যেরও নিয়ন্তা। এই কারণে কি জড়প্রকৃতি, কি অধ্যাত্মজগত, সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুনিয়মসকল অবিচলিতভাবে কার্য্য করিয়া চলিতেছে। সেই সকল নিয়মের মধ্যে কখনই বিশৃঙ্খলা ঘটে না। পাপী অবশ্যই দণ্ড পাইবে, পুণ্যবান অবশ্যই পুরস্কৃত হইবেন।

ধর্ম্মের এই তত্ত্ব, অধ্যাত্মজগতের এই অচলপ্রতিষ্ঠ সত্য নিয়ম, যিনি অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে অবগত হন, তিনি অশ্রদ্ধার বিনাশকারক পাশজাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অন্তরে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা পোষণ করিবেন।

৫। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"।

শ্রদ্ধাবান জ্ঞান লাভ করেন। তিনি কি প্রকারের জ্ঞান লাভ করেন? যে জ্ঞানে পরম শান্তি লাভ করা যায়। ভারতের পূর্ব্বতন ঋষিরা বেশী কথা বলিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতার ফল সারবান অথচ স্বল্পাক্ষর কথায় ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। আমাদের মত তাঁহারা প্রত্যেক কথা বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে চাহিতেন না। তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা সাধনের পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন।

৬। সাধন ও সংযম।

সাধনের পথে সকল বিষয়ে সংযম আবশ্যক। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান আবশ্যক হইতেছে বাক্‌সংযম। মহাসাধক মহামতি ব্যাসদেব ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে সাধকের অভিজ্ঞতালব্ধ একটী মহাসত্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সংযতেন্দ্রিয়, তৎপর ও শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন এবং জ্ঞানলাভ করিয়া অচিরে পরম শান্তি লাভ করেন এবং অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধাবান সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ঋষিরা সাধনায় বিষয়ে শ্রদ্ধার উপর বড় বেশী ঝোঁক দিয়াছেন। তাঁহারা অন্ধ ভক্তিকে বিশেষ আমলে আনেন নাই।

৭। শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

ভক্তিমান ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন, তাঁহারা এ কথা না বলিয়া শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন, এই কথাই বলিয়াছেন। তাঁহারা ভক্তি অপেক্ষা শ্রদ্ধাকে সম্পূর্ণ পৃথক ও উচ্চ দৃষ্টিতে দেখিতেন। এই পার্থক্য দেখাইবার জন্যই বোধ হয় গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে, "যোগিনা-মপি সর্ব্বেষাং, মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"

৮। শ্রদ্ধা ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়।

ভগবানকে ভজনা করাই তো ভক্তির কথা—ঈশ্বরে ভক্তি না থাকিলে তাঁহাকে ভজনা করার কোন কথাই আসিতে পারে না। তবে সেই সকল ঈশ্বর-ভজনশীল ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রদ্ধাবানকে যুক্ততম বলা হইল কেন? ভক্তি অন্ধ এবং শ্রদ্ধা চক্ষুষ্মান। আমরা পিতাকে পিতা বলিয়াই ভক্তি করি। তাঁহার দোষগুণ কোন বিষয়ে লক্ষ্য করিতে চাহি না। আমি তাঁহাতে অবশ্য ভক্তিমান হইতে পারি। কিন্তু যদি আমার পিতা সর্ব্বদাই শুভ-কার্য্যে রত থাকেন দেখি, অন্যায়ের প্রতি অধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ দেখি, দেখিয়া যদি তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তি অর্পণ করি, তবে সেই ভক্তিই হইল শ্রদ্ধা। ইহা হইতে বুঝিতেছি যে, কাহারও বিষয় জানিয়া, সদ্গুণ ও সাধু ভাবসকল উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রতি যে ভক্তি অর্পণ করা যায়, তাহাকেই শ্রদ্ধা বলে। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রদ্ধা বলিলেই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান চাই। শ্রদ্ধাতে ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় সাধিত দেখিতে পাই। শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে আমরা যে প্রকার সাধারণত এক অর্থে দেখি, পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা যে উভয়কে সে প্রকার একার্থ বলিয়া দেখিতেন না, তাহার প্রমাণ—শঙ্করাচার্য্য বিবেকচূড়ামণির একস্থানে বলিয়াছেন "শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যানযোগান্মুমুক্ষোঃ"।

৯। শ্রদ্ধার বিষয় উচ্চতর আত্মা।

শ্রদ্ধাভাবকে বিশ্লেষণ করিয়া যেমন দেখিতেছি যে, শ্রদ্ধার ভিতরে ভক্তি উহ্য থাকে, জ্ঞান উহ্য থাকে,